-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

চেতনা ও মহাচৈতন্য

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

মুদ্রণ মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১
প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬ ১৫ই এপ্রিল, ২০০৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পোষ্টঃ- লেকটাউন, কোলকাতা - ৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পোষ্টঃ- লেকটাউন, কোলকাতা - ৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in

Website : www.avinabadarshan.com

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

মহাসৃষ্টির জলে স্থলে অন্তরিক্ষে সৃষ্টির শুরু থেকেই বয়ে চলেছে এক মহাচেতনার সুর, মহাচৈতন্যের সুর। সে সুর, সে ছন্দ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই পরিদৃশ্যমান জীব-জগৎ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। অনন্তবিশ্বের সর্বত্রই অবিরাম গতিতে মহাচৈতন্যের ধারা বয়ে চলেছে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির সেই অনাদি অনন্ত সুর, যা হতে সব কিছুর সৃষ্টি। এই মহাচৈতন্যের বীজ প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি গাছপালা, জীবজন্তুর মধ্যেই বিদ্যমান।

প্রতিবস্তুতে অবিরাম চৈতন্যের সুর প্রবাহিত হচ্ছে বলেই বস্তুর রূপের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। যার পরিবর্তন আছে তারই প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। আবার রূপের পরিবর্ত্তন হলেও সত্তা বা চৈতন্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আমরা যখন একদিন শুক্রকীটাকারে মাতৃগর্ভে ছিলাম, তারও আগে যখন রক্তকণিকায় ছিলাম, খাদ্যে ছিলাম, আকাশে বাতাসে, জলে, আলোতে, অগণিত অণু-পরমাণুতে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাকের ছিলাম, সে অবস্থাতেও মন ছিল, প্রাণ ছিল, চৈতন্য ছিল। সেদিনকার সেই মন, সেই প্রাণ, সেই চৈতন্য আজও এই দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে অনন্ত সৃষ্টির যাত্রাপথে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু আবিষ্কার, তা এই চৈতন্যের কণার সুরগুলিকে মন্থন করেই। মহাশূন্যের গহ্বর হতেই মহাচৈতন্যের সৃষ্টি। আর সেই চৈতন্যের কণাগুলি প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে আবার মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। দুধে যেমন মাখনের কণাগুলো ছড়িয়ে থাকে, মন্থনে সেইগুলিকে জমাট বাঁধিয়ে মাখন তৈরী করা হয়; তেমনই যদি মননের মন্থনে মহাশূন্যের চৈতন্যের কণাগুলোকে জমাট বাঁধিয়ে নিতে পারা যায়, তবেই সেই আদি শক্তির সুরকে আয়ত্ত করে প্রকৃতির সকল ক্ষমতাকে করায়ত্ত করা সম্ভব হবে।

বস্তু নিয়েই জগৎ। আর এই চৈতন্যময় জগতে সকল বস্তুর ভিতরে প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। বস্তু মাত্রই সজাগ ও সচেতন। তাই জড় পদার্থ বলে কোন কিছু নেই। জড় পদার্থ পান করে (জল), গ্রহণ করে (তাপ, আলো), ভক্ষণ করে, ঘ্রাণ নিয়ে যদি জীবন রক্ষা হয়, চৈতন্যের সাড়া পাওয়া যায়, তবে সে যত বড় জড় পদার্থই হোক না কেন, সে চৈতন্যেই জড়িয়ে আছে। কোন বস্তু যদি সবসময় একই রূপে থাকে, তবেই তা জড়পদার্থ। কিন্তু যে পদার্থের রূপান্তর আছে, পরিবর্ত্তন আছে, লয় আছে, ক্ষয় আছে, তাকে জড়পদার্থ বলা যায় না। তার মধ্যেও প্রাণের সাড়া আছে, সেও চৈতন্যে ভরপুর।

আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে রোগ-শোক, দুঃখ-ব্যথা, যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে চলেছি। প্রকৃতি বলছেন, ঐ রোগ রোগ নয়, ঐ দুঃখ দুঃখ নয়, ঐ শোক শোক নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঐ মহাচৈতন্যের সঙ্গে এক যোগাযোগে যুক্ত হতে না পারছি, ততক্ষণ এইগুলি আমাদের চলতেই থাকবে।

পিনের খোঁচায় যেমন রেকর্ড থেকে গান বের হয়, তেমনি মনরূপ পিনের খোঁচায় আমাদের নিজ নিজ দেহবীণা যন্ত্রের রেকর্ড থেকে মহাশূন্যের মহাচৈতন্যের সুর বেজে উঠবে। তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত চাওয়া পাওয়ার সন্ধান পাব। সে কারনেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সচেতনের খাদ্য চায়, প্রকৃতির গ্রন্থের পাঠ চায়, শান্তি চায়, পরম শান্তি চায়। আবার এই রেকর্ড ব্রেক হলে অন্য সুর বাজতে থাকে। তখন শুধু বাড়ী চাই, গাড়ি চাই, নাম চাই, যশ চাই — এসবই শুধু বাজতে থাকে।

জাগতিক বিষয়বস্তুর অগণিত অণু-পরমাণু sense বা চৈতন্য ভরপুর। যেখানে চৈতন্য রয়েছে, সেখানেই মন-প্রান, বিচার-বুদ্ধি, বিবেক আছে। আর এই বিবেক প্রতিমুহূর্ত্তে সকলকে সজাগ করে দিচ্ছে। বিবেক বা চৈতন্য স্রষ্টার মহা দান। বিবেক বা চৈতন্যই আমাদের দেবতা, আল্লা, গড্ (God) এঁরা মন্দির, মসজিদ বা গীর্জায় থাকেন না। তাঁরা থাকেন প্রতিটি বিবেকবান মানুষের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে। তাই চৈতন্য স্বরূপ বিবেকই একমাত্র আমাদের দেবতা, আল্লা, গড্। আর এই মহাচৈতন্যস্বরূপ দেবতা, আল্লা, গড্‌কে কি করে যার যার নিজ নিজ দেহক্ষেত্রে জাগানো যায়, তার প্রচেষ্টাই হ'ল সৃষ্টির মহান ও বিরাট উদ্দেশ্য।

চেতনা ও মহাচৈতন্যর সুরে জীবকুলকে যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **অভিনব দর্শনের** ২৪তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল **চেতনা ও মহাচৈতন্য**।

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬ — ***চপল মিত্র***

ইং ১৫ই এপ্রিল, ২০০৯ — ***(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)***

আমরা সব সময় প্রার্থনা করবো, হে চেতনা, হে মহাচৈতন্য আমাদের ভিতরে জাগ্রত হও

১৪ই মে, ১৯৬৭
২৮, শরৎ বোস রোড, কলকাতা

এক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ঠাকুর, মহাশূন্যে আদিশব্দ যেটা, আদি ধ্বনি যেটা, সেটা কি করে আসলো? শব্দটা প্রথমে কি করে আসলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন, চারিদিক নিস্তব্ধ। সবাই চুপ করে আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শোনার অপেক্ষায়। এই নিস্তব্ধতার মাঝে হাতে একটি তালি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, এই যে শব্দ হলো, ধ্বনি হলো, এটা যেমন একটা ধ্বনি, আবার যেটা বলা হোল না, সেটাও একটা ধ্বনি। কাউকে 'এস' বললে ধ্বনি হয়, আবার হাত দিয়ে ডাকলেও, ইশারা করলেও ধ্বনি হয়। নীরবতার মধ্যে থেকে বিভিন্ন অণুপরমাণুর সংমিশ্রণে যে ধ্বনি হয়, সেই ধ্বনি বা নাদ বা শব্দ কোথা থেকে হয়? কি করে হয়? মহাশূন্যে মহাকাশে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি হতে থাকে, গর্জন হতে থাকে। আবার কোন শব্দ নেই, কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। তাতেও একটা শব্দ হয়ে যাচ্ছে। সেটা নীরব, সেটা শোনা যায় না। এই যে অবস্থা, সেটাও একটা শব্দ।

এই যে **নীরবতায় বসে সাধক ধ্যান করছে, চিন্তা করছে, মনন করছে, সেটাও একটা ধ্বনি। যেটা ফাঁকা রয়েছে, সেটা নেই-এর অবস্থা। এই যে নেই-এর অবস্থা, এটাও একটা ধ্বনি।** বাতাসে জল যেমন দেখা যায় না, কিন্তু বাতাসে জল যে আছে, সেটা বুঝা যায়। তেমনি সমস্ত ফাঁকাই শব্দময়, ধ্বনিময় হয়ে রয়েছে। তার কোন শব্দ নেই, গুরুগম্ভীর

আওয়াজ নেই। 'নাই'-এর অবস্থায় ভরপুর হয়ে রয়েছে। যেখানে 'নেই' থাকবে, সেখানেই ভরপুর থাকবে। যেখানেই 'নেই' থাকবে, সেখানেই ধ্বনি থাকবে। বিষয়বস্তু যেখানে খুঁজে পাওয়া যায়না, যেখানে কোন কিছু নেই; এই যে নীরব অবস্থা, এটাই ধ্বনির অবস্থা। এই যে শব্দ (হাততালি দিয়ে) আসছে, কোত্থেকে আসছে? কাঁসার থালাতে, বাটিতে বাড়ি (আঘাত) দিলে শব্দ হয়। কাঁসাতে শব্দ ছিল বলে বাড়ি দিলে ধ্বনিত হল। ঐ ধ্বনির প্রকাশ হল। প্রকাশ না পেলে কি শব্দ থাকে না? এই অনন্ত ফাঁকা, এতে টোকা দিলে বাজে। সেই বাজনার রূপ, এই জগতের রূপ। সমস্ত জগৎটা শব্দেরই প্রকাশ, ধ্বনিরই প্রকাশ। এই ফাঁকার মধ্যে ধ্বনি এমন সুন্দরভাবে রয়েছে যে, একটুতেই বেজে ওঠে। কাঁসার বাসনের মধ্যে ধ্বনি এমনভাবে রয়েছে যে, ঘরের ভিতর চিৎকার করলেই বা শব্দ করলেই বাসন বেজে ওঠে।

তোমার মাঝে বাড়ি দিলে অর্থাৎ অবিরাম অবিরত মহানাম করলে বা বীজমন্ত্র জপ করলে যে ধ্বনি শোনা যায়, নুপূরের বাজনা শোনা যায়, সেটাই নাদধ্বনি! এই নাদধ্বনি তোমার ভিতরে ধ্বনিত হচ্ছে। কোত্থেকে ধ্বনিত হচ্ছে? তোমার ভিতরে যে ধ্বনি জাপ্য ছিল, সেটাই বেজে উঠছে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্র যে ঘাঁটছো, কোন্ সাধনার পথিক হলে সব সমাধান হয়, জানতে পারছো কি? সাধনার নিয়ম কি? আমাদের এই দেহই হ'ল সমাধানের যন্ত্র। বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মে **সমাধান হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।** তবে কেন সমাধান হবে না? বেদের আদি কি? সমস্ত সুর; সুরধ্বনিই বেদের আদিধ্বনি। অনন্তবিশ্বের সবকিছু নাদধ্বনিতে ধ্বনিত; সব ধ্বনিময়। সুতরাং ধ্বনির সাধনাই আমাদের সাধনা। এই সৃষ্টির কারণ কি? উদ্দেশ্য কি? জানতে হবে। এই অনন্ত বিশ্বের নিয়মের ধারাবাহিকতার ধারাকে জানা; সমস্ত বিশ্বের বস্তুর বস্তুত্বকে, তার অস্তিত্বকে জানাই নিজেকে জানা। এই অনন্তবিশ্বের স্রষ্টা কে? ভগবান কে? কোটি কোটি পৃথিবীর, অগণিত পৃথিবীর বিরাট বিরাট সত্তা ও সুর রয়েছে। সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়েই স্রষ্টার পূর্ণত্ব। সবকিছু নিয়েই স্রষ্টা পূর্ণ।

তোমার যন্ত্র কি বলে? তোমার দেহবীণাযন্ত্রে কি আছে? বৃত্তির

নিবৃত্তিকল্পে অনন্ত চাহিদা; তার সাথে সাথে দর্শন, অনুভূতি সব আছে। কাজেই আমাদের কাজের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। তোমার যন্ত্রে প্রমাণের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। এরচেয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব আর কিছু আছে? তুমি তোমাকে যে শূন্যময় করে ফেলেছ, প্রতিটি ইন্দ্রিয় যে শূন্যেরই বার্তা বহন করছে, এই শূন্যের অবস্থা, ভরপুরেরই অবস্থা। শূন্যই পূর্ণ। সবকিছু অবস্থা নিয়েই পূর্ণ। সবকিছু অবস্থা নিয়েই এই জগৎ। এই ফাঁকার অবস্থা চিরকালই ছিল। ফাঁকার কোন আদি নেই, অন্ত নেই। আমাদের মধ্যে সেই সুর বিদ্যমান। সমস্ত বিষয়বস্তুর সমন্বয়ের সুর নিয়ে যখন আমরা, তবে আমরা কেন বুঝবো না? **কেন বুঝবো না সৃষ্টির উদ্দেশ্য? কেন আমরা ভাগ্যফলের উপর নির্ভর করে থাকবো? জাগতিক সবকিছু স্রষ্টার চিন্তাধারা ছাড়া আর কিছু নয়। স্রষ্টার এই সৃষ্টি হতেই হল মন।**

আমরা জীবনের সর্বাবস্থায় সুখশান্তি লাভের জন্য যে সাধনা যে প্রচেষ্টা করছি, তাতো বুঝতে পারছি। আমরা চাইছি পরম শান্তি। কিন্তু শান্তির সুরটা ভরতে পারছি না। এই পাত্রটা ভরে কি করে? বাপ দাদা সবাই শান্তি চাইছে। পরম শান্তির সাধনায় যে যেদিকে পারে, পূরণ করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। ভোগের ভিতর দিয়ে বল বা যোগের ভিতর দিয়ে বল, এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বাহ্য তৃপ্তিতেই শেষ নয়। এই তৃপ্তি অন্তর্নিহিত তৃপ্তির বাহ্যিক রূপমাত্র। সেই স্বরূপকে যদি জানতে চাই, জাগতিক জগতে সবকিছু এমনভাবে সাজানো রয়েছে, এমনভাবে ভরপুর হয়ে রয়েছে যে, তার ভিতরে মনন করলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন সেখানে পৌঁছাতে পারে। এটা যেভাবেই আসুক, ফাঁকা হতে আসুক, তাঁকে এনার্জি বলুক, স্রষ্টা বলুক, যেভাবেই নামকরণ করুক, এতবড় কারিকুরি যাঁর, বিবেক-বিচার বুদ্ধি দিয়ে যিনি আমাদের তৈরী করেছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বদর্শী। তাঁর বুঝ সীমাবদ্ধ নয়। এটা ইউনিভার্সের ছকের মাঝে হারমনির ন্যায় আপনসুরে বেজে উঠছে। স্বাদের ভিতর দিয়ে, দর্শনের ভিতর দিয়ে এই বাজনাটা বেজে ওঠে। সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, সৃষ্টবস্তুসমূহের ভিতর দিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁর বিরাটত্ব, তাঁর মহিমার ব্যাপকতা বুঝতে পারা যায়। আমাদের দেহবীণাযন্ত্রে শ্রবণ ইন্দ্রিয়, দর্শন ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতির মাধ্যমে প্রতিমুহূর্ত্তেই বুঝতে পারছি; অনুভব করছি প্রতি মুহূর্ত্তে। তিনি এমন বুঝে বুঝদার, তাঁর মতো বুঝনেওয়ালা কেউ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ,

তিনি বিরাট। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়ে আছেন। তাঁকে কোন ব্যাখ্যায় আনা যায় না, বর্ণনায় আনা যায় না। তবে আমাদের মন যদি সেইদিকে এগিয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই তিনি সেটা বুঝতে পারেন এবং সাড়া দেন। নতুবা সৃষ্টির মাঝে সবকিছু এমনভাবে সাজানো, দেখা যেত না।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আবহমান কাল হ'তে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছু এমন সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে, এমন setting হয়ে রয়েছে যে, মনে হয় কে যেন বুঝে বুঝে আমাদের প্রয়োজনের সব সামগ্রী পরপর সাজিয়ে রেখেছেন। কে যে করছেন, কিভাবে করছেন কিছুই জানি না। **আমরা খাদ্য গলাধঃকরণ করি। কিন্তু কোথা থেকে রক্ত, বীর্য, মাংস, অস্থি হয়, আমরা জানি না। কোথা হতে পিত্ত পড়লো, কিভাবে এ্যাসিড হ'ল, জানি না। আমরা কিছুই করছি না। শুধু খাদ্য গলাধঃকরণ করছি।** তাও আমরা করছি না। আপন সুরে উদরের ক্ষুধায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিবৃত্তিকল্পে সুখের জন্য টেনে নিচ্ছে। বৃত্তিগুলো আপনসুরে বেজে উঠছে তাগাদার তাগিদে। আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় শান্তির কামনায়, সুখের কামনায় সেই মহাশূন্যের দিকেই ধাইছে। প্রতিটি জাগতিক সুরেই (বিষয়েই) সেই ফাঁকার ইঙ্গিত, মহাশূন্যের ইঙ্গিত পাচ্ছি।

এই মৃন্ময় পৃথিবীতে কত রূপ রয়েছে। প্রতিটি রূপই যেন রূপে রূপে রূপান্তরিত হয়ে অরূপের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে। যিনি এতবড় বিরাট, এতবড় চিন্তাশীল, সর্বজ্ঞ, তিনি কোথায় কিভাবে আছেন, জানি না। তবে এই জগতে, এই দেহবীণাযন্ত্রে কোথায় কি আছে, কিছুটা অন্ততঃ জানি। সমাধানের যন্ত্র প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ। আমরা অন্যায় করছি, বুঝের যন্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছে। সূর্য উঠছে কিনা, ভোর হয়েছে কিনা, তার আভাষ দিয়ে বুঝছি। এতটুকু ত্রুটি হলেই সজাগ করে দিচ্ছে। একটা মিথ্যা কথা বললে, কৌশল অবলম্বন করতে গেলে ভিতর থেকেই বলে দেয়, 'ঠিক করছি না।' এই সজাগের সুরে সুরময় হয়ে থাকাই ধ্যান। এই সজাগ হয়ে থাকার প্রচেষ্টাই সাধনা। এই সজাগকে নিয়ে সবসময় যে সজাগ থাকবে, সচেতন থাকবে, সেই হচ্ছে সাধক। প্রতি মুহূর্ত্তে সচেতন হয়ে

থাকবে। তুমি তোমার ভিতরে সচেতন থাকবে। সেই অনন্ত সুর খুঁজে পাবে। সেই অনন্ত সুরের সন্ধান তখনই যে পাবে। কোন হিতোপদেশ, এখানকার কোন বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যার দরকার নেই। বেদান্ত, উপনিষদ তো সেদিনকার কথা। শাস্ত্র তো সেদিন সৃষ্টি হয়েছে। আর এই জগৎ চলছে অনাদিকাল হতে। **দেহের ইন্দ্রিয় হোক, অন্তরিন্দ্রিয় মন হোক, যাই হোক, তোমাকে সদাসর্বদা সচেতন করে দিচ্ছে। এই চেতন মহাচেতনের চেতন, চেতনা ও মহাচৈতন্যের চেতন।**

'আমি প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ থাকবো', এই সাধনায় সজাগ থেকো। আম গাছের বীজ থেকে আম গাছই হয়। বটবৃক্ষের বীজ এতটুকু। সেই এতটুকু বীজের কতবড় ক্ষমতা। বীজটা ভেঙে দেখতো, গাছ খুঁজে পাওয়া যায় কি না। আমাদের মধ্যে যে বীজ, যে মহাশক্তির বীজ, চেতনার বীজ আছে, সেটি দেহের মাঝে গ্রাহ্যের মধ্যে, বুঝের মধ্যে, বুঝে বুঝে গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে। দেহক্ষেত্রের সেই বীজ হতেই জেগে উঠবে মহাশক্তির ধারা। অনন্ত চেতনার ধারা ফোয়ারার মত, Mountain হতে Fountain-এর মতো বইতে থাকবে মূলাধার হ'তে সহস্রারে; আবার সহস্রার হতে মূলাধারে। জগতের বিভিন্ন সুরকে একসুরে মিলাবার জন্যই দেহের মাঝে এতগুলি ইন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক— এই বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে আমরা সবসুরকে একসুরে মিলতি করবো। **আমরা সবসময় প্রার্থনা করবো, 'হে চেতনা, হে মহাচৈতন্য, আমাদের ভিতরে জাগ্রত হও।** হে কসাস্ (Cautious), তুমি সদাসর্বদা জাগ্রত থেকো।' এই আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে (দুই ভ্রূ-র মাঝখান) ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ত্রিধারা; সেখানে তিলক। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের সমন্বয়ে এই যে তিলক ধারণের রীতি, এই তিলকই সজাগের প্রহরী হয়ে সজাগ থাকতে বলছে। আমাদের গ্রামদেশে চৌকিদাররা, পাহাড়াদাররা গভীর রাত্রে হাঁক দিয়ে যেতো, বস্তিওয়ালা, খবরদার, জাগো.....। হে বস্তিওয়ালা, হে গ্রামবাসী, তোমরা সজাগ হও। তোমরা সচেতন থেকো, জেগে থেকো। তোমরা প্রতিমুহূর্ত্তে সচেতনে চেতন হও।

প্রকৃতি বলছেন, 'তোমাদের দেহের মাঝে অনন্ত শক্তি জাপ্য হয়ে রয়েছে। এই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও

সহস্রার জেগে উঠুক। এই জাগরণের জন্যই ধ্বনি। মন্ত্রের ভিতর দিয়ে, নামের ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে সেই সুর। এই ১৬ নাম, ৩২ অক্ষরেও সেই সুর, সেই ধ্বনি।'' সাধনা আর কিছু নয়, তোমরা সজাগ হও। **সজাগে সজাগ থেকে নিজের নিজের কাজ করে যাও। জীবনে আঘাত আসবে, ব্যথা-বেদনা আসবে। সাময়িক অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু পরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। এরচেয়ে আনন্দ আর নেই।** চুলকানিতে যে আনন্দ, এখানকার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির আনন্দ, এখানকার আত্মহারার আনন্দও ঠিক তাই। এখানে পালিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে ফাঁকির খেলাতে কতটুকু আর আনন্দ পাওয়া যায়। তুমি তোমার মধ্যে আগে ভরপুর হও। ভরপুরের যে অবস্থা, এটা ধ্বনির অবস্থা। ওস্তাদ 'আ' করে থাকে। আর কোন শব্দ নেই। ভিতরে ভিতরে সুর খেলতে থাকে। এই আলাউদ্দিন (এশিয়ার সুরসম্রাট), ওর বড় ভাই আফ্তাবুদ্দিন, আমার কাছে আসতো। আমি যখন কুমিল্লায় যেতাম, ওরা আমার কাছে এসে বসে থাকতো। আলাউদ্দিনকে যদি জিজ্ঞাসা করা হ'তো, 'সা'-র অর্থ কি? তাহলে বলতো, 'আল্লারে, কইতে পারতাম না।' এই সা সা রে রে রেওয়াজ করে করেই সে পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেছে।

বিখ্যাত ওস্তাদ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুরু করেছে। সুরের লহরী চলতে চলতে হাঁ করে রয়েছে। তারপর শুরু হ'ল ত্যানা ত্যানা। তারপরে আ-আ-। ১৫ মিনিট পর একটা সোম লয়। 'আ'- করার আধঘণ্টা পরে সোমে ফেলে দিচ্ছে। দর্শকরা, শ্রোতারাও নীরব। নীরবেই চলেছে সুরের খেলা। নীরব সুরধ্বনির ধ্বনিতে গায়ক এবং শ্রোতা উভয়েই তৃপ্ত হচ্ছে। **আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিকর্মের ভিতর দিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে থাকতে চাই। যে আত্মতৃপ্তিতে পরমতৃপ্তিতে থাকবে, সে-ই পরম ধনী।** ধনী কথাটা কেন আসলো? যে পরমতৃপ্তিতে থাকবে, তার চেয়ে ধনী আর কেউ নেই। ৫০ লক্ষ লোক তো আমিই নেড়েছি। লক্ষ লক্ষ শিষ্য করেছি। এই যে লক্ষ কোটি টাকার মালিক হয়ে কত ধনী ব্যক্তি আছে। তাদের বেশীরভাগেরই প্রতিমুহূর্ত্তে অশান্তি; অথচ থাকে এয়ারকন্ডিশনে। কিন্তু আমার সেটুকু নাই। কারণ আমি থাকি নিরিবিলিতে। দেশের বাড়ীতে আমি বেশীরভাগ সময় থাকতাম খড়ের ছাউনি দেওয়া একটা ঘরে। আমার ঘরে যে শান্তি, যে আনন্দ আমি পাই, তাতো তারা পায় না।

প্রতিমুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে সজাগ, সে-ই বড় সাধক। এটা কত বড় কথা। আমাদের মধ্যে অহংকার, অহমিকা ও নানা সংকীর্ণতায় ঘিরে ধরেছে। তারজন্য প্রতি মুহূর্ত্তে বেড়াজালে পড়ছি।

এই যে আজকাল এত সাধু, গুরু ট্যামের মত গজিয়ে উঠেছে, এদের বেশীরভাগেরই ভিতরে কোন ক্ষমতা নাই, অন্তর্যামিত্ব নাই। আধ্যাত্মিক কোন শক্তিই প্রকাশ করতে পারে না। ধর্মের নামে জনগণকে শোষণ করার জন্য তাদের কত রকম কৌশল করতে হয়। সবকিছুর সমন্বয় সাধন করে সুরে সুর বেঁধে যে চলে, সে'ই হ'ল সত্যিকারের সাধক। মধুর ভাব কি করে আসে? দর্শন কি করে হয়? দেখ, একটা চুনের প্রলেপ দিলে আয়নায় দেখা যায় না। আবার ঐ চুন দিয়েই আয়না পরিষ্কার করতে হয়। বিবেকের প্রলেপ দিয়ে আমাদের অন্তরকে পরিষ্কার করতে হবে। সেইজন্য আমরা দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। আমাদের অন্তরালে এমন সূক্ষ্ম কোঠায় দর্শন রয়েছে যে, সেখানে ঢাকনি দেওয়া রয়েছে। তা হতে আমরা চ্যুত হয়ে পড়েছি। এটা একপ্রকার সংস্কার, একপ্রকার দ্বন্দ্ব। আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ছাড়া কাজ নেই। একটা ধুক্ ধুক্ ছাড়া কাজ নেই। দ্বন্দ্বে আমাদের ঘিরে ধরেছে। দ্বন্দ্ব যখন থাকবে না, আপনি স্ফূরণ হবে। আপনি ফুটে উঠবে। স্বচ্ছতা থাকলে কেন ফুটবে না? সেই স্বচ্ছভাবে সব সৃষ্টি হয়েছে। সেইভাবে যখন আসবে, আপনি আপনমহিমায় বিকশিত হবে। কলমের গাছে তো এক বছরের মধ্যেই ফল ফলে। আমরা হয় কলমের গাছ, না হয় এমনি গাছ। তবে কেন ফুটবে না?

আমাদের ভিতরে সেই বীজ আছে। একটু স্মরণে একটু চিন্তায় থাকলে ফুটবেই। তোমরা ভরপুরের পূর্ণ অবস্থায় রয়েছ। তোমাদের ভিতরে ফুটবেই। শুধু তুমি মহানামের মহিমায়, গুরুপ্রদত্ত বীজমন্ত্রের মহিমায়, নাদধ্বনির মহিমায় বসে থাক। দেখ, এই আলাউদ্দিন সা সা রে রে করে কত বড় হয়ে গেল। আগে বিয়ে বাড়িতে ঢোল বাজাতো। এখন প্রেসিডেন্ট আলাউদ্দিনকে নিয়ে তার আসনে বসায়, কোলাকুলি করে। আলাউদ্দিন কি করলো? শুধু সা সা রে রে করে রেওয়াজ করে গেল। এই সা রে গা মা পা ধা নি — সপ্ত সুর। আবার দেহবীণা

যন্ত্রের মাঝে আছে, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার— আরেক সপ্তসুর। মহান ঋষিরা দেহের মাঝে এই সা রে গা মা দিয়ে দিলেন। এই সুর তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরই সৃষ্টি— এই ধ্বনি। এই যে অ আ ক খ, এতো নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে না। এই ৩৬ অক্ষরের মারপ্যাঁচে হল রবীন্দ্রনাথ। আর ২৬ অক্ষরের মারপ্যাঁচে হল সেক্সপীয়র। এই ২৬টা, ৩৬টা অক্ষর যাঁরা তৈরী করলেন, তাঁরা হলেন ঐ বাল্মীকি ধরণের ঋষি। আবার তাঁরাই তোমরা। কারণ তোমরা হলে তাঁদের উত্তরপুরুষ। সূর্যের তেজ আছে তোমাদের ভিতরে। ধুয়া খেতে গেলে একটা কাঠি জ্বালালেই যথেষ্ট। সেই কাঠি জ্বালিয়ে ধুয়া খেতে খেতে চলে যাচ্ছে। আবার এই কাঠিতে সূর্যের ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে আমাদের ৯৬°/৯৭° ডিগ্রিতে কেন আগুন জ্বালানো যাবে না? ভারী আতস কাঁচে সূর্যের তাপটা concentrate করে যেমন আগুন জ্বালানো যায়, আমাদের আজ্ঞাচক্রেও রয়েছে সেই সূর্যেরই শক্তি। সূর্য তাঁর নিজস্ব তাপ আমাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। এই সূর্য শক্তি আমাদের মধ্যে ন্যস্ত রয়েছে। থার্মোমিটারে আমাদের দেহের যে তাপ ৯৮° ডিগ্রী, সেই তাপ সূর্যেরই তাপ। আমরা যদি সেই সূর্যশক্তিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করি, যেকোনভাবে যদি কাজ করি, তবে কেন আগুন জ্বলবে না? কেন আগুন জ্বালানো যাবে না?

আসন সর্বত্র। সমস্ত পৃথিবীময় আসন। যেকোনভাবে শুয়ে দাঁড়িয়ে, বসে আসনে কাজ করা যায়। শ্বাসে প্রশ্বাসে ২৪,০০০ (চব্বিশ হাজার) বার খালি শ্বাস নিয়ে ফেলে দিও না। শ্বাস চায় নাদ। তাকে এমনি ছেড়ে দিও না। টেনে নাও। টেনে নেওয়ার জন্য সুর। একটু কাজ করো। এমন মধুময় অবস্থা মনের মাঝে আসবে, ভাবতে পারবে না। **চিন্তা করে দেখতো, সবতো চলে যাচ্ছে। তুমিও যাবে; তারজন্য প্রস্তুত হও। যেখানে পরিবর্ত্তন, রূপান্তর অনিবার্য, সেখানেই জন্ম-মৃত্যুর খেলা। আমরা পথিক; অনন্ত পথের যাত্রিক। কোন বিতর্কে যাওয়ার দরকার নেই। এতবড় বিভূতি, এতবড় জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত (মৃত্যু) আমাদের সামনে, চিন্তা করা যায় না।** নিজেকে তৈরী করার এতবড় দর্পণ আর কোথাও নেই। গুরু কোথায়? গুরু কি করেন? গুরু শুধু বলেন, 'এই কর, ওই কর।' তিনি নতুন করে কিছু তৈরী করেন না। প্রত্যেকের হবে। কাম,

ক্রোধ, লোভ, মায়া-মোহের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাজ হবে। তোমরা ত্যাগী হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ। আমরা ভোগের রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। যে জিনিস খেলে লয় হয়ে যায়, সেটা কি খাওয়া? এটা কি বাঁচা? যা খাচ্ছি, তাতে কি করছি? খেয়ে তো মরার পথের যাত্রিক হচ্ছি। মৃত্যু পথের যাত্রিক যখন আমরা, এখানকার কোন খাওয়াই খাওয়া নয়। মরার খাওয়া এই সব। শ্মশানে মুখে জল দেয়। সেই শ্মশানের খাওয়া খাচ্ছি। সুতরাং এই খাওয়া খাওয়া নয়। এই ভোগ ভোগ নয়। যাত্রিক হিসাবে, পথিক হিসাবে ততটুকুই দাম, যতক্ষণ না যাই। এখানকার এই ভোগ লবণের জ্বালা, চুলকানির জ্বালা। **এইখানকার তৃপ্তি হচ্ছে চুলকানির তৃপ্তি। যে তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী, সেই তৃপ্তি মৃত্যুরই একটি অবস্থা। দেহের যেকোন বৃত্তির নিবৃত্তি, সাময়িকভাবে দাদের খাউজানি (চুলকানি)।**

আনন্দ কোথায়? যেটা চিরকাল থাকবে, সেটাই আনন্দ, সেটাই যোগ। যে তৃপ্তি চিরকাল থাকবে, সেটাই পরম তৃপ্তি। তোমায় যদি বলি, 'এই তোমার মা, তুমি কি বলবে?' মায়ের মতন শাড়ী পরেছে, মায়ের মত দেখতে, মা এইরকম শাঁখা পরতো, সবই মিলে যাচ্ছে। আবার বলছে, 'আমার মা কোথায়?' নিজের গর্ভধারিণী মা না পাওয়া পর্যন্ত, বলতে থাকবে— 'আমার মা কোথায়?' যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরমতৃপ্তির সঙ্গে মিলতে না পারছো, ততক্ষণ এই ঘূর্ণির ছকের মাঝে ঘুরতে হবে। অঙ্ক করতে করতে এখান থেকে লন্ডনে চলে গেছে। কিন্তু পূরণ (গুণ) আর মিলছে না। হাতের 'এক'টা বাদ দিয়ে গেছে। আমরা সব করছি ঠিকঠাক। কিন্তু 'এক' বাদ দিয়ে। পাঁচে পাঁচে দশ, সাতে তিনে দশ; অঙ্ক ঠিকই করে যাচ্ছে। কিন্তু মিলছে না। মিলাবার চেষ্টা করতে করতে লন্ডন পর্যন্ত চলে গেছে। কিন্তু হাতের 'এক'টা যে বাদ দিয়ে দিয়েছে, সেটা খেয়াল নেই। কাজেই মিলবে কি করে?

ইউনিভার্সের এই মহাগণিতের অঙ্ক কষে কষে আমাদের মহাতিথিতে মিলতে হবে। আজ যে তিথি, কবে অমাবস্যা, কবে পূর্ণিমা, সব অঙ্ক কষে বার করেছে। জীবনে চলার পথে সবকিছু গণিতের মাঝ দিয়ে হচ্ছে। আমাদের চিন্তাধারার সাথে এই গণিত যদি মিলাতে পারি, তবেই মিলনের সুরে পূর্ণ হতে পারবো। এই মানচিত্র হতে নিজেকে জান।

এটাই সাধনা, এটাই জ্ঞান, এটাই ধ্যান।

একজন ভক্তের জিজ্ঞাসা, 'ঠাকুর', সাধনা আমরা কি করবো? না সে-ই করিয়ে নিচ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, 'আমি এর আগেই তোমাদের বলেছি, বিবেক, বিচার, বুদ্ধি সবই তিনি (প্রকৃতি) আমাদের দান করেছেন। বৃত্তির নিবৃত্তিতে, ইন্দ্রিয়ের তাগিদে, দেহের ক্ষুধায় আপন সুরে সাধনা করিয়ে নিচ্ছেন। আপনি তাঁর বুদ্ধিতে বুঝে বুঝেই আমরা চলছি। সেই বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে তোমরা সেইভাবে কাজ করে যেও। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

চৈতন্য থেকে সৃষ্টি বলেই প্রতিটি বিষয়বস্তুই সচেতনতায় ভরপুর

২রা এপ্রিল, ১৯৮১
সুখচর ধাম

মহাকাশ হ'ল শূন্য। ঐ শূন্যটাই Self হচ্ছে সচেতনতায় ভরা একটা পরম কিছু, যাকে চৈতন্য বলবো। মনে করে দেখ, ফাঁকা, শূন্য আবার চৈতন্য, চৈতন্যে ভরা। কী করে? অথচ এই ফাঁকা থেকেই সৃষ্টি। আর প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই সচেতন। এই ফাঁকার আদি নেই, অন্ত নেই। আরম্ভ নেই, শেষও নেই। তাই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন যদি কেহ করে, 'কে সৃষ্টি করলো'? তারপরের প্রশ্ন হবে, 'তাকেই বা কে সৃষ্টি করলো?' আবার প্রশ্ন হবে, 'আবার তাকে কে সৃষ্টি করলো?' এর সমাধান এইভাবে কোনও দিন হতে পারে না।

জিজ্ঞাসার যে সমাধান হতে পারে না, সেটা তো ঠিক কথা নয়। বিষয়বস্তু থাকলেই তার সমাধান থাকে। যে বিষয়বস্তুতে সমাধান নেই, সে সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হলেও সঠিকতার অভাব। প্রশ্ন যখনই আসবে, উত্তর সাথে সাথেই থাকবে। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে বল? বাবার বাবা, তার বাবা, তার বাবা, তারও বাবা, এক জায়গায় না একজায়গায় ঠেকবেই। সব বাবার শেষ সীমানায় যেতে হবে। সৃষ্টির ধারায় পৃথিবীরই সৃষ্টি হয়েছে। এই পৃথিবীর বুকেই সবার বাস। এই পৃথিবীর বুক থেকেই যখন সব বাবারা এলো, তখনই তুমি প্রশ্ন করতে বাধ্য, ''আগে এই পৃথিবীটাকেই বা কে সৃষ্টি করলো?''

সুতরাং সূর্য থেকেই হোক বা মহাকাশের বিষয়বস্তু থেকেই হোক, নানারকম ভাবের, নানারকম পথের মধ্যে একটা না একটা পথ থাকবেই। সৃষ্টি আছে যখন, স্রষ্টা একজন থাকবেই। তারও উপরের কথা, সেই স্রষ্টাকে কে আবার সৃষ্টি করলো? সুতরাং এর মীমাংসা হচ্ছে না। মীমাংসা না হলেই বুঝতে হবে, recurring চলছে, চলছে, চলছেই। কিন্তু বস্তুই

যখন আছে, তখন একটা আদি অবস্থা থাকবেই। যখন 'বস্তু' আছে, তার আদিতে বস্তু একটা বা কারণ অবস্থার একটায় ঐ প্রশ্ন, ঐ চিরন্তন প্রশ্ন শেষ হতে বাধ্য।

সেই প্রশ্নের উত্তর হল একটাই, এই ফাঁকাকে কেহ সৃষ্টি করতে পারে না। ফাঁকা কোন বস্তু নয়, যা (পরিবর্তনের বা জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে) রূপান্তরের ধারায় চলতে বাধ্য। ঐ ফাঁকাই একমাত্র অনাদি অনন্ত, যার কোন সৃষ্টি হতে পারে না। ঐ সেই ফাঁকা, তাকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং জবাব হলো, ফাঁকা হতে সব সৃষ্টি হয়। কিন্তু ফাঁকাকে কেহ সৃষ্টি করতে পারে না। ফাঁকা, চিরকাল ফাঁকা। ফাঁকা ..... ফাঁকা .....ফাঁকা। এর এ.....ও নাই, ও.....ও নাই। উঁচু নাই, নীচু নাই। এ-ই হ'ল অনাদি, অনন্ত। এর আরম্ভ নাই শেষও নাই। এর কিছুই নাই। তাই ঐ ফাঁকা হতেই, 'নাই' হতেই জীব জগতের সৃষ্টি। তাই সব প্রশ্নের মীমাংসা হলো ফাঁকার কোন সীমা নেই, রূপ নেই, আরম্ভ নেই, কিছু নেই।

এই যে অগণিত গ্রহ, নক্ষত্র ফাঁকা হতেই সব সৃষ্টি। একটা, দুটো গ্রহ নয়, একটা দুটো সূর্য নয়। অনন্ত অগণিত সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। সমস্ত 'শূন্য'টাকেই যেন গ্রহ নক্ষত্রে ঘিরে রেখেছে। গ্রহ, নক্ষত্র যদি এক, দুই করে গণনা কর, তার সীমা আছে। সে তখন গণনার মাঝে রয়েছে। একটা সীমার মাঝে রয়েছে। এই মহাকাশে এক সেকেন্ডে যদি ৫০০ লক্ষ কোটি হাজারস্য হাজার গ্রহ নক্ষত্র গুণে যাও, তাও তুমি লক্ষ কোটিস্য কোটি বছরেও গ্রহ-নক্ষত্র গুণে শেষ করতে পারবে না। গ্রহ নক্ষত্রের গণনায় গণিতের সীমানায় যখন বেড় পায় না, তখনও কিন্তু গণিতের সীমানার মধ্যেই আছে।

এই ফাঁকা থেকে সৃষ্টি যখন হয়, কেমন করে হয়? ফাঁকা হ'তে এর Answer মিলবে কি? ফাঁকার মধ্যে কোন উত্তর তো নেই। এর মাও নেই, বাবাও নেই। এর কিছুই নেই। তবুও অনন্ত কোটি বছরের এই ফাঁকাটাই একটা Sense; একটা সচেতনের সুর। এটা কেমনে হল, কি করে হ'ল? বুঝা তো যায় না। দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। দেখার মত কিছু নাই। খোঁজার মত কিছুই নাই। কিন্তু তবু দেখতে পাচ্ছ,

সচেতনে ভরা। এতে অনুভূতি, বুদ্ধি বিবেচনার যোগ আছে সর্বস্তরে, সর্বত্র সর্বভাবে। এই যে বিবেচনা, বুদ্ধি সাজানো গোছানো, সুসজ্জিত সব, এত সুন্দর setting কি করে হ'ল? সৃষ্টবস্তুসমূহের মধ্যে যে কার্যকলাপ, গতিবিধি; তাতে এই জগতের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম setting— তা ফাঁকা হতে কি করে হতে পারে? কি করে সম্ভব?

সম্ভব হতে পারে ফাঁকাটাই যদি sense হয় অর্থাৎ consciousness-এ ভরা হয়, চৈতন্যময় হয়। **চৈতন্য থেকে সৃষ্টি হওয়ার ফলে প্রতিটি বিষয়বস্তুতেই সচেতনতা থেকে যাচ্ছে। তার (শূন্যের) sense কখনও নষ্ট হতে পারে না। তাই সমস্ত জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুতে রয়েছে ঐ "সজাগের সুর।"** সেই "সজাগের বুঝ" যে আছে, তার পরিচয়টাও পাচ্ছি। সেটা বুঝতে হবে। সেই পরিচয় পত্রটা হচ্ছে, "এই তোমার, তোমাদের প্রত্যেকের সচেতনতা", বুঝলে? এটাকে বুঝলে তা (তোমার সচেতনতা) নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেবে, তার (মহাশূন্যের) সচেতনতাকে। তার সচেতনতা বলতে গেলে, সে একটা ব্যক্তি হয়ে যায়; একটা ব্যক্তিবোধ এসে যায়। কিন্তু ব্যক্তি কই? কেহ তো নাই। অথচ তা (শূন্য) থেকে যা বের হচ্ছে, তাতে প্রত্যেকেই সজাগ। তাড়াতাড়ি বললাম। এ খুব কঠিন। জিনিসটা কঠিন। এ এক কঠিন তত্ত্ব। বুঝতে সময় লাগবে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

Sense-এর মাখন সেই sense-এই ভাসে। সেই sense মাখনই সব চালাচ্ছে।

২০শে জুলাই, ১৯৭৫
সুখচরধাম

আমাদের দেহের ভিতরে যে sense আছে, চৈতন্যসত্তা আছে, যার দ্বারা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্ত কার্যকলাপ হয়ে যাচ্ছে, আজপর্যন্ত এই sense-টাকে কেউ ধরতে পারছে না। এখানে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সবাই গোঁজামিল দিচ্ছে। এই যে কথা বলছো, হাত নাড়ছো, কিভাবে করছো? বাচ্চা শিশু কিছুই জানে না। কিন্তু হামাগুড়ি দিতে দিতে ঠিক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা সব আসছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজগুলি সব হয়ে যাচ্ছে। এগুলো কিভাবে হচ্ছে? কোথা থেকে আসছে? কি করে আসছে? টুকরো টুকরো করে সমস্ত দেহটাকে কাটলেও তো এর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ sense-টাতো সবের মধ্যেই আছে। Sense-টা যেন কতকটা Electric Current-এর মতো। যেমন current-এর প্রকাশ হচ্ছে light-bulb-এর মধ্য দিয়ে, Fan-এর মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারা নির্দিষ্ট গতি ছাড়া অন্য পথে যেতে পারে না।

আমাদের Body-র যে action, এতো এক একটা machine-এর মতো। তফাৎটা হচ্ছে, এর ভিতরেই বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা শক্তি আছে। সেটা কি করে সম্ভব? সেটা কিভাবে আছে? Body-র ভিতরে যে ক্ষমতাটুকু আছে, তাতে যেন সমস্ত sense-গুলোকে মাখনের মতো concentrate করে নেওয়া হয়েছে। **Sense-এর মাখন সেই sense-এই ভাসে। সেই sense মাখনই সব চালাচ্ছে। Sense টা external. Body machine-এ concentrate করে sense মাখনটা তৈরী হচ্ছে। আর thought-ই সেকাজ করছে।**

ঘুম হচ্ছে সমাধির একটা stage। ঘুমের মধ্যে যেটা হচ্ছে, সেটা যেন মৃত্যুরই একটা রূপ। এই যে জাগ্রত অবস্থা, এটাও একটা সমাধি। মাঝে মাঝে সকলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। স্মরণ করে করে চলতে হয়। এই জাগ্রত অবস্থার টুকরো টুকরো sense গুলো একত্র করে, concentrate করে মুনি ঋষিরা ঘুমের সমাধির অবস্থাটা জাগ্রত stage-এ আনতে চেষ্টা করলেন। এটাই হচ্ছে সাধনা। দেখনা, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে খুব পোলাও, মাংস খেলে পেট কিন্তু ঠিকই ভরে যায়। স্বপ্ন দেখে, বিয়ের রাত্রি উদ্‌যাপন করছে। এমন মাত্রায় concentrate হচ্ছে যে discharge হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে, গঙ্গার ধারে প্রস্রাব করছে; জেগে দেখলো বিছানা ভেসে গেছে। স্বপ্নে দেখছে, সাপে কামড় দিয়েছে। উঠে দেখলো, হাতে একটা জায়গা লাল হয়ে ফুলে গেছে। স্বপ্নে দেখলো, ঝড়, বৃষ্টি, বাদলের মধ্যে চলছে। উঠে দেখলো সর্দি লেগে গেছে। এক জায়গায়ই শুয়ে আছে। কিন্তু action টা ঠিকই হয়ে যাচ্ছে। আবার স্মরণ করে করে dream-এর কথাটা মনে আনতে হচ্ছে। ঘটনাটা যাই হোক, ঘুমের মধ্যে একটা কিছু হয়েছিল, এটা তো ঠিক।

এই ঘুমের সমাধিটা যদি জাগ্রত অবস্থায় আনা যায়; ঘুমিয়ে যা দেখেছিল, জেগে উঠেও তাই দেখছে, এমন যদি হয়, তবে ঘুমন্ত অবস্থা ও জাগ্রত অবস্থা এক হয়ে যাবে। আরও যদি মাত্রা নামিয়ে মৃত্যুর অবস্থায় আনতে পারা যায়, তবে মৃত্যুর অবস্থার সব কিছু জানা যায়, জাগ্রত অবস্থায় থেকেই। যেমন ধর, একটা avil (ঘুমের ওষুধ) খেলে ঘুম হয়। আবার ৫টা avil খেলে মৃত্যু হয়। তেমনি ধর, ১২ মাত্রায় ঘুমন্ত অবস্থা জাগ্রত অবস্থায় এক করে নিল। আরও ২ মাত্রায় মৃত্যুর অবস্থায় এসে যায়। সেই মৃত্যুর অবস্থায় body-তে কোন sense থাকছে না। আগুনে পুড়িয়ে দিলেও বুঝতে পারবে না। কিন্তু sense-টা concentrate হয়ে যায়, আর ইচ্ছামতই কাজ করা যায়। সেই concentrated sense seed-টা বেরিয়ে যায় আর nature-এর আবহাওয়ায় form (আকার) নেয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি কারুর সঙ্গে কথা বললে। মুহূর্ত্তের মধ্যে চন্দ্রে চলে গেলে। তারপর বৃহস্পতিতে গেলে। এমনি করে ৫ মিনিটের মধ্যে চারপাঁচটা গ্রহে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে আসতে পারবে। অথচ তুমি

আসনেই বসে আছ।

এই sense-seed, body sense concentrate করেই হচ্ছে। এটার পরিমাপ হবে দেখতে ঠিক একটা বালিকণার ১ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। চিন্তা করে দেখ, কত সূক্ষ্ম চৈতন্যের কণা। এর মধ্যে তোমার সব অনুভূতি, বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, will সবই আছে। Diamond, Silver সবই এর মধ্যে আছে। এর অবাধ গতি। কোন বাধাই একে বাধা দিতে পারে না। আগুনে পোড়াতে পারে না। মহাকাশের যে কোন জায়গায় যেতে পারে, এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্রতম time-এ দেখবে, কোথাও জলের সাগরে দুরন্তগতিতে ছুটে চলেছে। আবার আগুনের সাগরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলছে তার সমান গতিতে। যখন দেহে আবার ফিরে আসছে, দেহের মধ্যে যে seed-টা আছে, তার একটা ধাক্কা খেয়ে তুমি জেগে উঠছো। দেখছো, ওখানে আসনে বসেই তুমি ঘুরে এলে। মৃত্যুর সময় দুটো seed এক হয়ে বেরিয়ে যায়। সব mathematics-এর মতো।

একটা সমাধির পর মাত্রা বাড়িয়ে আর একটা সমাধিতে natural course-এ টেনে নিয়ে যায়। যেমন বাস থেকে নেমে সামনে কিছুটা দৌড়ে যেতে হয় natural course-এ ঠিক সেরকম। তোমরা যে বসে আছ, কে বসে আছে? কারোরই কোন অস্তিত্ব নেই। এটা একটা সাময়িক form. Sense আছেও আবার নেইও। Sense-টা কোথায়? হাত, পা তো machine-এর (মেশিনের) মতো কাজ করে যাচ্ছে। Original-টা কোথায়? বাতাস বন্ধ করলে তুমি থাকতে পারছো না। সবার উপরে depend করেই তোমার জীবন। সেটা কি জীবন?

সাধনার দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যু সমাধির stage-এ যখন আসছো, দেখবে সত্যি যারা মরে গেছে, তারা এগিয়ে এসে তাদের দলে টানার জন্য তোমায় ডাকছে। তারা বলছে, 'তুমি মরে গেছ। আমাদের সঙ্গে এস'। তুমি বলছো, 'না মরিনি। আমি জীবন্ত অবস্থায় মৃত্যুর stage-এর অবস্থাগুলো উপলব্ধি করছি।'

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

যেই জিনিসের পরিবর্ত্তন আছে, তারই প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। একেই বলে চৈতন্যময় জগৎ

সুখচর ধাম
৫ই মে, ১৯৭৮

প্রকৃতির এই বিরাট গ্রন্থে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ও বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়েই আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে সৃষ্টির তত্ত্ব দর্শন, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সৃষ্টি রহস্য। প্রকৃতি প্রত্যক্ষতার মাঝে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে কোথায় আমাদের সত্যিকারের আবাস, কোন্ প্রয়োজনে জীবজগতের সৃষ্টি এবং কিভাবে কোন্ পথে আমাদের চলতে হবে। নিয়মের ভিতর দিয়েই সবকিছু চলছে এখানে।

প্রকৃতি ফাঁকি দেয়নি কাউকে। তোমার আমার মাঝে যে বুঝ আছে, বাচ্চা শিশুর মাঝেও সেই একই বুঝ আছে। তার বুঝটা এলোমেলোভাবে আছে বলেই শিশুর দৃষ্টিও এলোমেলো। বয়সের সাথে সাথে ঘাতে প্রতিঘাতে সেই সহজাত বুঝের বীজই ধাপে ধাপে জেগে ওঠে, পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। বিরাটের সেই বিরাট শক্তিকে এমনি করেই আটক রাখা হয়েছে সবার দেহবীণাযন্ত্রের মাঝে। যে বীজ পোঁতা হয়, তা থেকে যে গাছ বের হয়, তাতে আবার সেই বীজই পাওয়া যায়। একটা ধান পুঁতলে তা থেকে যে গাছ বের হয় তাতেই আবার হাজার হাজার ধান হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সবাই এখানে এসেছি এতটুকু সুর ও সাড়া নিয়ে। কিন্তু **মৃত্যুর পর যখন সেই সত্তাটা চলে যাবে মহাশূন্যে, তখন সেটা যাবে অজস্র সাড়া নিয়ে। মনের মন্থনে মন্থনে দেহস্থিত বুঝ ও চৈতন্যের কণাগুলো জমাট বেঁধে যাওয়ার ফলে, তখন সে নিজস্ব সত্তা ও বুঝ নিয়ে স্বেচ্ছাধীনে চালিত হয়ে বিশ্বের সর্বত্র বিচরণ করতে পারবে। জল, বাতাস ও তাপ যেমন আকাশের সাথে মিশে গিয়েও প্রতিমুহূর্ত্তে আপন সত্তা নিয়ে বিচরণ করছে— কখনও ধূম্রাকারে, কখনও মেঘের আকারে,**

আবার কখনও বৃষ্টি ও বরফের আকারে; আমরাও যাতে সেইভাবে স্বেচ্ছাধীনে দেহ নিয়ে শূন্যমার্গে মহাকাশের সর্বত্র বিচরণ করতে পারি, তার জন্যই জীবজগতের সৃষ্টি।

যে পৃথিবী একদিন দাউ দাউ করে জ্বলতো, সেই আগুনের গোলার মধ্যে কি করে গাছপালা এল, কি করে পাহাড় পর্বত এল, কিভাবে জীবজগতের সৃষ্টি হল, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রয়োজনের সাথে সাথেই সবকিছু সৃষ্টি হয়ে আসছে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তাই দেখি, প্রয়োজনের সাথে সাথেই মাতৃস্তনে দুধের সঞ্চার হচ্ছে। জীবের প্রয়োজনে খাদ্য ও পানীয় এসেছে। জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আলো, জল ও বাতাস এসেছে। জীব যাতে সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে, তার জন্য জীবজগৎ সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই এসেছে বুদ্ধিবৃত্তি।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে মিশে থাকার অবস্থা থেকেই এসেছে সবাই মিশতে মিশতে। মিশেই রয়েছে সবাই সবকিছুর সাথে; আবার চলছে সবাই মিশে যাবার প্রচেষ্টায়। **যতক্ষণ না মিশবে, ততক্ষণ বুঝ পাকা হবে না। তাইতো কাম-ক্রোধ-লোভের মাঝে সবাইকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। রোগ শোক, ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত করা হয়েছে। যা কিছু করার স্রষ্টাই আমাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।**

মহাকাশের শূন্য গহ্বর হতেই মহা চৈতন্যের সৃষ্টি। মহাকাশকেই তাই চৈতন্যরূপে বর্ণনা করা চলে। জীবের যে চেতনা, তা মহাকাশেরই সুর। মহাকাশের মহাধ্বনি অবিরামগতিতে এগিয়ে চলছে-চলছে-চলছে। সাথে সাথে অনন্ত সৃষ্টিও হয়ে চলেছে। গতি যেখানে ধ্বনিও সেখানে। এই ধ্বনিকে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলেছে সৃষ্টি।

প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবজগতের পরিবর্ত্তন, পরিবর্ধন ও রূপান্তর ঘটছে। শিশু ধীরে ধীরে শৈশব, কৈশোর, যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যের পথে পা বাড়াচ্ছে। বয়সের সাথে সাথে শিশু বয়সের বুঝ বুঝে বুঝে 'বুঝের' সাথে মিশে গিয়ে 'বুঝকে' আরও প্রবল করে আরও বুঝ বুঝে নিচ্ছে। এই যে 'মহা-বুঝ' এটি আছে প্রত্যেকেরই মাঝে জাপ্য আকারে (অবস্থায়)।

এই যে অনন্তকাল হতে জীব দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে চলেছে— বুঝের পর বুঝটা যে প্রবল হতে হতে চলেছে— এর শেষ কোথায়? কোন কিছুরই পরিপূর্ণতা নেই, কিছুতেই পরিতৃপ্তি নেই। দেখার শেষ নেই, চলার শেষ নেই, খাওয়ার শেষ নেই, বুঝার শেষ নেই, চাহিদারও শেষ নেই। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ইন্দ্রিয়গুলি আরও চাহিদার দিকে যেতে থাকে। দড়ি ('কাছি') ধরে ধরে যেমন পাহাড়-পর্বতে উঠতে হয়, তেমনি বাস্তব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, এই বাহ্য ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করে করে কল্পনায় হোক বা যেভাবেই হোক, আমরা সবাই চলেছি সেই অনন্তগতির পথে, সেই বিরাটের দিকে। **সেখানে যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি কোথায়? কোথায়? কোথায়? এমন একটা ভাবনার মাঝে সকলে ধাইছে, যেন স্রষ্টাকে ধরে ফেলবে। সকলে সেই চেষ্টাই করে চলেছে। কিন্তু তাঁকে যে ধরা যায় না; কোন বর্ণনায় আনা চলে না। তিনি খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়েই রয়েছেন।**

এখানকার তথাকথিত শাস্ত্রগ্রন্থের মাঝেও আছে সেই একই চাহিদার কথা— নানারূপে নানাবর্ণে অজস্র প্রশ্নের সমারোহে। যতই প্রশ্ন জাগছে, দেখছি এই জগতের মাঝে চলার পথে চলছি আর ভাবছি, কি করে এই জগৎ এলো? তার কারণ কি?

তত্ত্ব কিভাবে আরম্ভ হয়? এই ভাবনার ভাবনাতেই তত্ত্ব চলতে আরম্ভ করলো। ঘর তৈয়ারী করতে প্রথমে কিছুই থাকে না। কাঠ-কুটো চালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তারপর আসলো রান্নার জিরা, ধনে, তেজপাতা। হরির কথায়, 'সংসার গুছাতে হবে।' তারপর শীতের লেপ, কম্বল এল। তারপর ক্রমে ক্রমে এল ঘর বোঝাই জিনিসপত্র। আজন্ম ঘর গুছানো শুরু হয়ে গেল। সব জিনিস এসে গেল। সব হয়ে গেল। তত্ত্বও তাই। তত্ত্বে বোঝাই কি করে হয়? কখন কি লাগবে, না লাগবে বুঝা যায় না। প্রয়োজনের তাগিদে, বাস্তবের তাগিদেই চলছে সব। তাতেই সব এনে ফেলছে।

এই জগৎসংসারে সূর্য কোত্থেকে এল? এই জীবজন্তু, জানোয়ার কে আনলো? এইসব প্রশ্ন জাগিয়ে দিল মনে। তত্ত্বের স্ফূরণ হতে শুরু করলো। তুমি কোথা থেকে এলে? সে কোত্থেকে এল? প্রশ্ন জাগছে।

কিন্তু বুঝতে পারছো না। আমি ছিলাম, আমি এলাম। আমি যাব। ছিলাম কোথায়? কোথায় যাব জানি না। 'ছিলাম', 'এসেছি', 'যাব' ও বুঝতে পারছি। 'ছিলাম', 'এসেছি', 'যাব', ব্যাস্ তিন পুরুষ হয়ে গেল। মীমাংসা করতে হবে, কোথায় ছিলাম, কোথায় যাব? এলাম যখন, নিশ্চয়ই কোথাও ছিলাম। এই যে sense, এই যে চিন্তা করতে পারছো, বিচারশক্তিতে জানা সম্ভব, বুঝতে পারছো, এটা তো এখানকার তৈরী নয়। শিশু থেকে বুঝটা বুঝতে বুঝতে যায়। শিশুর বুঝ আর আমাদের বুঝ, একই বুঝ। শুধু মাত্রাগত পার্থক্য। শিশুর ভিতর বেদনা বোধ, খাওয়ার বোধ, গমনের বোধ ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিগুলি ছিল। এগুলির চালনাতে শিশুর বৃদ্ধি হচ্ছে। দেখা গেল, শিশুর ভিতরে বুঝ ছিল। **এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে চৈতন্যের সাড়া রয়েছে; আজ যে চৈতন্য দেখছো, তাহা আদিতে ছিল। আদিতে যে বুঝ ছিল, তাহাই চলছে।**

গর্ভের শিশু গর্ভে যেদিন এল, এই এতটুকুনু ছিল সে। গর্ভে যেদিন এল, যতটুকুনু তার বুঝবার ক্ষমতা, ততটুকুই ছিল। আবার ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখা গেল, একদিনের শিশুর মধুর স্বাদের বোধ আছে। কারণ একদিনের শিশুকে জিহ্বায় মধু দিলে চুপ করে যায়। জন্মগ্রহণ করা মাত্র তার জ্ঞানের সঙ্গে, এই স্বাদ, এই মিষ্টত্ব বোধ তার বোধে ছিল, জানাতে ছিল। তার কণ্ঠে, তার জিহ্বায় এই মিষ্টত্ব বোধ, তিক্ততা বোধ, তার (শিশুর) জানা ছিল বলেই এই সোয়াদ (স্বাদ) সে পেল। শীত, গ্রীষ্ম আবহাওয়া যন্ত্রে এমনভাবে জানিয়ে দেওয়া ছিল যে, পরে তার (শিশুর) বুঝতে কোন অসুবিধা হোল না। শীত? না, গরম কি করে সে বুঝলো? দেখা গেল, মাঘ মাসের তীব্র শীত, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম বোধ, তার জানা ছিল। তার 'চাওয়া-পাওয়া', 'ব্যথার সময়', 'খাওয়ার' সময় 'মা'ই বুঝে বুঝে দেন। কাজেই এই বুঝ তার ছিল। যা সে এখানে এসে পাচ্ছে, তা কোথায় ছিল?

শিশু ১০ মাস মাতৃগর্ভে ছিল। আবার যেদিন, প্রথম দিন এই ক্ষেত্রে (ধরাধামে) এসে উপস্থিত হলো, অর্থাৎ যখন সে ১ দিনের ছিল, তখনও তার শ্বাস প্রশ্বাস ছিল; বিশ্বজগতের সাড়ার সেই সাড়া তার ভিতরে ছিল। প্রথম দিন যখন সে উপস্থিত হলো, এই বীজে সেই বীজ

ছিল। এই ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হবার সময়ও এই বুদ্ধি, বিচার, চৈতন্য তার ভিতরে ছিল। আবার সেইখানেই তা শেষ হলো না। সেই বীজশক্তির চৈতন্য আরও চৈতন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল বলেই এসেছে।

সেই চৈতন্য আবার কি করে এল? বাতাসে, আগুনে, জলে চৈতন্যের সাড়ার সমাবেশে মিলিত হয়ে সেই চৈতন্য চৈতন্যময় হয়ে ছিল। এই চৈতন্যের সাড়ার সাড়া ছিল দেহবীণাযন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিতে। তাই যে জল, যে বাতাস, যে তাপ আমরা সহজভাবে উপলব্ধি করছি, তার ভিতর সাড়া আছে, সুর আছে, চৈতন্য আছে। তা নানাভাবে খাদ্যের ভিতর দিয়ে, রক্তের ভিতর দিয়ে মিশ্রণে মিশ্রণে উদ্ভব হয়ে এসেছে। এ বলে আর শেষ হয় না। নানাবস্তুর ভিতর দিয়ে, একটার সঙ্গে আর একটার সংমিশ্রণে, মিলিত হয়ে, উদ্ভব হয়ে এসে উপস্থিত হলো। যখন বাতাস এল, সাথে সাথে জল এল, তাপ এলো। শুধু তাই নয়, তারাও আবার আরও বহু বহু বস্তুর সংমিশ্রণ হতে এল। কাজেই প্রতিক্ষেত্রে ছিল বুঝ, ছিল চৈতন্যের সাড়া। এই সাড়ায় সাড়ায় সব সাড়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ একত্রিত হয়েই আজ এই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব দেখা গেল। তাই প্রতি বস্তুতে প্রতি ধুলিকণাতে আছে সেই চৈতন্যের সাড়া; সব মিশিয়ে শুকিয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

যেই জিনিসের পরিবর্ত্তন আছে, তারই প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে। একেই বলে চৈতন্যময় জগৎ। বাইরে থেকে কাঠ বা দেওয়াল দেখে মনে হয় না যে, সেই বোধশক্তি বা চৈতন্যশক্তি আছে এর ভিতরে। কিন্তু আছে; না হলে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে দাবানল জ্বলে উঠতো না। শুকনো কাঠের মধ্যেও যে রয়েছে দাহিকা শক্তি, চৈতন্য শক্তি তখনই তা বুঝা যায়। তাই এই বাস্তব ক্ষেত্রে, পরিদৃশ্যমান জগতে যেকোন বস্তুতে দেওয়ালে, মাটিতে সবেতে সেই চৈতন্যের সাড়া সুষমভাবে বিদ্যমান যে রয়েছে, তা বুঝতে হবে। তুমি 'যাকে বুঝি' বলছো, খুঁজলে এই বুঝ তুমি খুঁজে পাবে না। নিজেকেও খুঁজে পাবে না। হাত-পা কেটে ফেললে তারা বুঝে না। দেহকে টুকরো টুকরো করো, তারা বুঝে না। নাড়িভুঁড়ি, বিষ্ঠা, রক্ত, চুল, নাক, কান, নখ, চক্ষু ইত্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশ হাজার টুকরো করে বাটিতে বাটিতে ভিন্ন ভিন্ন নামে রাখলেও বুঝবে না কে

এটা। চৈতন্য কোথায় গেল? কে চৈতন্য? সব তো কাঠ, মাটিই হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি কোথায় গেল? আবার টুকরো গুলো একত্র করে জোড়া দিলেই এক ব্যক্তি হলো। আগে খণ্ড খণ্ড অংশে খুঁজে পাওয়া গেল না। একত্র করলেই সেই ব্যক্তি বলছে, ''হম বুঝতে পারতা হ্যয়।''

এই ব্রহ্মাত্বও তাই। এই জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে খুঁজতে গেলে সব মাটি, সব লোপাট হয়ে যায়। নাক, মুখ, চোখ কোথায়? কান কোথায়? পা কোথায়? বিভিন্ন নামে সব অভিহিত হয়ে গেল। আবার এইসব একত্র করলেই হয় চৈতন্য, সাড়া, বুঝ। সব সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে সবার মাঝে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে একই যোগাযোগে যুক্ত হয়ে আছে। **যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে শক্তি আছে, তত্ত্ব আছে, বুঝার মন্ত্র আছে, মনন শক্তি আছে। আবার আমরা বলি, 'কই, আমরা তো বুঝতে পারছি না।'** 'কাল কি হবে, জানতে পারছি না।' দেবতা কিভাবে থাকেন, জানা নেই আমাদের। সূর্য কোথায় ছিল? কোথা থেকে এল? জানি না। এই না জানাটাই বিশ্বরহস্য। বিশ্বরহস্যের নিয়মই হচ্ছে, প্রতিমুহূর্ত্তে জানতে জানতে অগ্রসর হচ্ছে। আবার ধু ধু করছে।

এই রহস্যটা জানা হয়ে গেলে আর তো কিছুই রইলো না। কাজেই না জানার সূত্রটা জানার অবস্থাতেই টেনে নিয়ে যায়, শূন্য জায়গাটাকে পূরণ করার জন্য। আবার টানা পাম্পে জলটাকে টানে। উপরে টানলে জল এসে যাচ্ছে। এই যে টানে জল উঠলো, তাতে কি ইঙ্গিত পাচ্ছি? অজানা বা না জানার যে টান আছে, জানার যে বস্তু, তা সেই টানে টানে উঠে গেল। এই যে ফুলটা হ'ল, তার ভিতর একদিন বীজ ছিল। ফুল বাতাস, আলোর আন্তরিকতা চাইছে। ওর ফুল হয়ে যাওয়াটা ওর কৃতিত্ব নয়। ওর (ফুলের) চাহিদার ভিতর থেকে 'ও' জেগে উঠছে। 'ও' যে ফুল হবে, তা জানতো না। আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হলো।

আমরাও এক জাতীয় চাহিদার মধ্যে রয়েছি। আমাদের ভিতরে তাই বীজ আছে। ক্রমে ক্রমে গাছ, পাতা ফুল ও ফল হবে। অনুতাপের অনুশোচনার অবস্থা এই জাগতিক নিয়মের মধ্যেই; আলাদা কিছু নয়। বাস্তবে আমাদের চাহিদা সুখ-দুঃখের সাথে জড়িত। সব কিছুর মধ্যেই তত্ত্ব; সকলেই তত্ত্বে আছে। রোগ, শোক, দুঃখ, সন্দেহ ছাড়া কে আছে?

কে কাকে সন্দেহ করে না? স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করছে। নানা নালিশ (হাজার হাজার) শুনছি। সুখ-দুঃখের ঝড় বয়ে চলেছে। কার সংসারে এটা নেই? কে না বলে, মহাদুঃখে আছে? **দেনা পাওনার মাঝে চলেছে জগৎ সংসার। বাইরে থেকে সবাই ভালোমানুষ। কারখানায় যখন ফেলা যায়, তখন বুঝা যায় প্রকৃত স্বরূপ। এক্সরে যন্ত্রের সামনে যখন ফেলা যায়, তখন বুঝা যায়, কার ভিতরে কি আছে।** প্রতিটি সংসারে এই যে ঝড় চলছে, তার ভিতরেই সবাই চায় একটু শান্তি। চাহিদা কোথা থেকে আসছে, কাউকে বুঝাতে হয় না। এই যে 'শান্তি চাই', এই চাহিদার কথা, কে কাকে বুঝিয়েছিল? একটা শিশু ও ঘুমাচ্ছে, 'শান্তি চাই'। এই যে অবস্থা বা এই যে 'শান্তি' বলে কথাটা, 'আনন্দ' বলে, 'সুখ' বলে কথাটা, ইহা আর কিছু নয়। কিভাবে একটা অভাব যেন সবসময়ে থেকে যাচ্ছে, তা পূরণ করতে চায়। তার জন্যই হ'ল দেহ। স্বাদে সোয়াদে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য হ'ল সুস্বাদু। আরও স্বাদে টেনে নেওয়ার জন্যই এই দেহযন্ত্র।

চার পয়সার গাঁজার লোভে এক মণ বোঝা বহন করলো, এক মাইল পথ হাঁটিয়ে নিল। নেশার টান এমনি টান। পাখিকে আফিং খাওয়ায়, সব জায়গায় ঘুরে ফিরে, আবার সে জায়গামত ঠিক ফিরে যায় তার খাঁচায়। আফিং-এর নেশায় সে (পাখি) ফিরে আসে। **সংসার হচ্ছে ঐ নেশা। সংসারেও আমাদের একটা নেশা আছে। এ নেশা গাঁজার, কোকেনের, মরফিয়ার নয়। এটা ইন্দ্রিয়ের নেশা। প্রকৃতি হতে দিয়ে দিয়েছে। এ নেশা বড় সাংঘাতিক, যার জন্য ঝড়-ঝাপটা সব চলছে।** গাঁজাতে তো পেট ভরে না। তবুও ঐ নেশার জন্যই ছুটছে। প্রকৃতির নেশাকে পূরণ করতে পারে না। তবুও ইন্দ্রিয়ের এই নেশা দিয়ে ঐ নেশাকে পূরণ করতে চায়। ভুলে থাকার জন্য সবরকম চেষ্টা করে; সকলের ভিতরে যে Original নেশা, তাকে পূরণ করার জন্য চেষ্টার বিরাম নাই। তবুও ঐ নেশা পূরণ হয় না। ইন্দ্রিয়ের নেশায় সবাই ব্যতিব্যস্ত। এই নেশা আক্কেল দেওয়ার জন্য নয়। এই নেশায় টেনে নিয়ে জানার পথটা সুগম করে দিচ্ছে, সহজ করে দিচ্ছে। কিন্তু পূরণ করে দিচ্ছে না। যদি পূরণ হ'ত, তাহলে আর এই প্রচেষ্টা হবে না। খাওয়ার চেষ্টা আছে বলেই, চাই নিজ খাওয়া। বাদশা খানা থেকে কত খানা

(খাওয়া); অমুক খাওয়া, তমুক খাওয়া কত রকম খেয়ে চলেছি উদরকে পূর্ণ করার জন্য। উদরের এই গহ্বর পরিপূর্ণ করতে সবাই চায়। শেষ অবধি কিন্তু এই গহ্বর আর পরিপূর্ণ হয় না। ইন্দ্রিয়ের কোন গহ্বরই পরিপূর্ণ হয় না। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রিয়ের এই গহ্বর গভীরতার একটা ইঙ্গিত মাত্র। গভীরতার গতিবিধিস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে জ্যামিতিক মানচিত্রের ন্যায়। ইহাই তোমরা পরিপূর্ণ করতে পারছো না। কাজেই বুঝে নাও, ইন্দ্রিয়গুলির কার্যকলাপ প্রকৃতির গভীরতাকে, প্রকৃতির ব্যাপকতাকে জানবার জন্য, জানাবার জন্য।

জীবনের চলার পথে যা কিছু কঠিনতম বলে মনে হয়, সৃষ্টির সৃষ্টবস্তুর মাঝে তাকে সহজভাবে 'বুঝের বুঝে' আনতে চেষ্টা করছে প্রকৃতি। সহজভাবে কিভাবে জানা যায়, তার পথটুকুনুকে সহজ করে দেওয়াই তাঁর কাজ। এই অভাববোধ আছে বলেই আমরা জানবার পথে অগ্রসর হতে পারছি। এই বিশ্বপ্রকৃতিতে কি আছে, সৃষ্টির আদিতে কি ছিল, কারা ছিলেন, চিন্তা করেছ কোনদিন? এই বর্ত্তমান জগতে যা চলছে, তুমি এলে বিয়ে করলে, ছেলে পিলে হ'ল, অর্থোপার্জন করলে, এতেই শেষ নয়। প্রকৃতির রহস্য শুধু নয়, নিজের স্বরূপকে জান। প্রত্যেকে নিজের স্বরূপকে, দেহবীণাযন্ত্রের রহস্যকে বুঝবার চেষ্টা কর। প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝাতে চাইছে।

নিজেকে জানাই সবকিছুকে জানা। কাজেই বলি, তোমরা নিজেকে বুঝ। অন্যকে কিছু বুঝাবার দরকার নাই। এই যে পটকে (দেবমূর্ত্তির ফটো) পূজা করছো; তাকে ডালা দিচ্ছ, ফুল দিচ্ছ, মান্য করছো, তার মানে নিজেকে তৃপ্ত করছো। অর্থাৎ ওঁর তৃপ্তির কথা চিন্তা করে নিজেকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করছো। পূজা-পার্বণের অন্তর্নিহিত অর্থ কি আছে, জান। লক্ষ-লক্ষ গ্রন্থ পাঠ কর, তাতে ক্ষতি নেই। তোমার প্রকৃতির গ্রন্থে, পূজা পার্বণকে উপলক্ষ্য করে এই পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোমের) গ্রন্থে কি আছে খোঁজ, তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখ— এতে পাবে বেদ, উপনিষদ, গীতা। তোমাতেই পাবে সব। অগণিত যোগের মাঝে তোমার এই গ্রন্থ এসেছে। রেকর্ড দেখলে কি বুঝা যায় যে, তাতে গান আছে? রেকর্ড শুধু একটা জিলিপির প্যাঁচ। ওটাতে পিনের খোঁচা

দিলেই গান বের হয়ে গেল, জনগণমন.....

পিনের খোঁচায় যদি রেকর্ড থেকে গান বের হয়, তবে মনরূপ পিনের খোঁচায় তোমার দেহবীণাযন্ত্রের রেকর্ড থেকে মহাশূন্যের মহাকাশের সুর বাজবে না কেন? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব এই রেকর্ডে (দেহক্ষেত্রে) বাঁধা রয়েছে। বিশ্বজগতের সমস্ত সুর, সমস্ত গান এতে গাঁথা আছে। পিনের খোঁচা দিয়ে এর থেকে সুর বার করো। এমনি Office-এ কাজের রেকর্ড থাকে। সারা বিশ্বের অর্থবোধের রেকর্ড এখানেই এই দেহক্ষেত্রে সুন্দরভাবে সাজানো আছে। এটাই হলো পঞ্চভূতের ধ্বনি। সপ্তসুর, সপ্তলোক ভূলোক, ভবলোক, মহলোক, জনলোক, গায়ত্রী সমস্ত আছে এতে। এর ভিতর (দেহবীণাযন্ত্রে) মনরূপ পিন দিয়ে মনন করো। তবেই বুঝবে, কোথা হ'তে এসেছ; কোথায় যাবে? কি তোমার চাওয়া, কি তোমার পাওয়া। সেজন্যই তোমার ইন্দ্রিয়গুলি সচেতন খাদ্য চায়। প্রকৃতির গ্রন্থের পাঠ চায়, শান্তি চায়, পরম শান্তি চায়। কিন্তু রেকর্ড ব্রেক হলে অন্য সুর বাজতে থাকে। তখন শুধু আমি বাড়ি চাই, খাওয়া চাই, গাড়ী চাই, নাম চাই, যশ চাই— এসবই শুধু বাজতে থাকে। রেকর্ড ব্রেক হলে সব বদলিয়ে দেয়। রেকর্ডের কাছে ভালোলাগার প্রশ্ন নেই। সকলের দিকে তাকিয়ে দেখ, বেশীরভাগই নাম, যশ, অর্থের পিছনে ধাইছে। তারপর একটু ধর্মকর্ম— আবার এই ব্রেক রেকর্ড। তখন দেখা যাচ্ছে পিন্ওয়ার্কে যা চলছে, রেকর্ডে তাই বাজছে। অন্য রেকর্ডে, ভালো রেকর্ডে আছে ভালো লাগার সুর— বিশ্বরহস্যকে জানবো, বুঝবো। জানার পথে জানতে জানতে সেই পরম সত্যবস্তুকে বুঝবো।

কিছুদিন আগের কথা বলছি। আমার এক শিষ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চাকুরী করে। বিয়ে করে নতুন বৌকে বলেছে, 'তোমার জীবনে যা যা করেছ, ঠাকুর আমাকে বলে দিয়েছেন।' নিজের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। তার স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। স্বামীর কাছে আরও ভাল হতে চেয়ে তার জীবনের সব কথা খুলে বলেছে। এইবার স্বামী সব শুনে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। ২২ দিন মাত্র বিয়ে হয়েছে। তারপর আমার নিকট আসলো। ছেলে তো 'আর করবো না' বলে খালাস। স্ত্রীকে ডাকালাম।

শাশুড়ী সব শুনে কান্নাকাটি। শেষে বললাম, 'যা হবার হয়ে গেছে।' কোনরকমে তাপ্পি তুপ্পি দিলাম। স্বামী স্ত্রীকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। কিন্তু এমন রোগ, — ধুঁয়ার দড়ি জ্বলতে জ্বলতে যায়। সংসারের মধ্যে একই রকমের কথা। কেহ ডাইরেক্ট (সোজাসুজি), কেহ মধুরভাবে বলছে। আমি তো হাজার হাজার মানুষ নেড়েছি। কোটিপতি, লক্ষপতিও একই চিন্তা করছে। রাস্তায় শুয়ে থাকে। ছাতু খায় ৩ খান লঙ্কা দিয়া। তারও চিন্তা কম নয়। বাচ্চার তেষ্টা পেয়েছে। জল চাইছে। জল না পাওয়া পর্যন্ত কাঁদবেই।

ইন্দ্রিয়গুলি চাইছে পরম বস্তুর সন্ধানে পরিতৃপ্ত হতে। কাজেই পরম বস্তুর বস্তুত্বের হদিশ যতক্ষণ পর্যন্ত না পাচ্ছে; সেই বস্তুর স্বচ্ছ জল তার ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রবিষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ এরূপ চলবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাহিদাকে সেই চাহিদায় পরিণত করতে না পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হা-হুতাশ করবেই। আমরা একটু একটু করে জল খাচ্ছি। খাওয়ার মাত্রা মাত্র একগ্লাস জল। এই যে দৈনন্দিন জীবনে নানা বস্তুর মাধ্যমে যে যা করে যাচ্ছে, তাতেই তৃষ্ণার ইঙ্গিত মিলছে। তোমরাও চলেছ; বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের সাধনা করছে। সন্ধানের দিকে যাওয়াই হচ্ছে তৃষ্ণা নিবারণের পথ। তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছো, গভীরভাবে চিন্তা করছো, 'আমি এমন জায়গায় যাব, যেখানে গেলে বিশ্বরহস্যকে জানা যায়।' এরূপ ভাবলে কি হয় জানো? ''রক্তচোষা'' দূর থেকে টেনে তোমার রক্ত যদি বের করে নিতে পারে, তবে ভাবনা দিয়ে বিশ্বের রহস্যকে কেন জানতে পারবে না? দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাজেই যে জিনিসে অসুস্থ হতে পারে, তাতে তুমি সুস্থও হতে পার। শুধু যদি ভাবতে পারো, আমি কিভাবে জানবো, বুঝবো, কেন এলাম? কোথায় যাব? সব সময় এই ভাবনাই যদি মনে মনে আলোড়ন করতে পার, সুফল ফলবেই।

মন্ত্র কি করে? এতগুলো কথা বলতে অসুবিধা। কাজেই একটা শব্দ বের করে দেয়; তাতেই কাজ হয়ে যায়। গড়ের মাঠ গভর্ণমেন্টের। এই 'গভর্ণমেন্ট' কথাটি একজনকে বুঝাতে সাড়ে এগার ঘণ্টা (11½ ঘঃ) সময় লাগবে। তাতে তো অসুবিধা। সুতরাং মন্ত্রটা হলো সেই তা

ধিন্-ধিন্-না, তা-ধিন্-ধিন্-না। এই মন্ত্রই ব্রহ্ম। বিরাট বোধ যদি সব সময়ে থাকে, তবে বিরাটের সুর বইতে থাকবে তোমার ভিতরে। **মন্ত্রের ভিতরে রয়েছে সমস্ত বিশ্বের, সমস্ত অণু পরমাণুর সুর ও সাড়া। সেই যাবতীয় বস্তুকে যদি বুঝাতে হয়, তাহলে কত কথা বলতে হয়। সেটা তো সম্ভব নয়।** অগণিত কথা যদি একটা কথায় বহন করতে পারি; বিশ্ব-রাজত্বের সমস্ত ধন যদি একটা cheque-এ নিতে পারি, তাহলে কত সুবিধা। সমস্ত বিশ্বরহস্যের মূল রয়েছে তোমাতে গাঁথা। সমস্ত বিশ্বরহস্যের মূলে রয়েছ তুমি। তুমি অর্থবোধে যদি চিন্তা কর, govt.-এর জায়গা, তাহলে কেমন চমকে ওঠো। বিরাট অর্থবোধে বিরাটের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকো। ঐ একটা মন্ত্রে রয়েছে সবকিছু। এই শব্দে রয়েছে সমস্ত অঙ্ক, সমস্ত অর্থ। কাজেই দিনরাত তা-ধিন-ধিন্-না, তা-ধিন্-ধিন্-না চলতে থাকবে। মনে রেখো, অভিনয়ে যে রাজা সেজেছে, পার্ট করছে রাজার, মনে হলো, বাস্তবেও যেন ঠিক রাজাই ছিল। তারপর গ্রীণরুমে পোষাক ছেড়ে পান, বিড়ি, সিগারেট ধরালো। আরেকজন করলো কৃষ্ণের পার্ট। এমন সুন্দর কৃষ্ণের পার্ট করল যে সব ফুঁপাইয়া, ফুঁপাইয়া কাঁদতে আরম্ভ করলো। যখন সে কৃষ্ণের পার্ট করছে, তখন সে কৃষ্ণের ভাবেই পার্ট করছে। তার কথায়, বার্ত্তায়, চলায় একটা নামই সে চিন্তা করে যাচ্ছে।

তোমরা যখন সত্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপূত হয়ে সেই দিক্ দৃষ্টি নিয়ে, সেই মন্ত্র নিয়ে চলবে, তখন দেখবে, সমস্ত গীত, সমস্ত চেতনা একটা মন্ত্রে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। স্রষ্টার সেই মন্ত্র নিয়ে, মন্ত্রের বিরাট শক্তি নিয়ে সাধনা করে কেন তুমি নিজে স্রষ্টা হবে না? আমগাছের বীজ থেকে আম-ই হয়। তুমি ইউনিভার্সের বীজ। স্রষ্টার সৃষ্ট চৈতন্য সত্তা। তবে তুমি অন্তর্যামী, সর্বব্যাপ্তমান, সর্বদ্রষ্টা কেন হবে না? অনুকরণ করে হনুমানের ন্যায় পাহাড় না নিলেও দুইমণ পাথর (ব্যায়াম করে) বহন করতে পারো। হনুমান বীরের সাধনা করলো। সাধনা করে তুমিও শক্তি অর্জন করো। বিশ্বসৃষ্টি দর্পণ স্বরূপ, নিজেকে গড়াবার জন্য। তোমার স্বরূপকে গড়বার জন্য এই দর্পণ দিয়ে অনুকরণ কর। সেই হনুমানের, সেই বীরের অনুকরণ করে আমরা শক্তিকে জাগরিত করবো। দর্পণে আমরা নিজেদের গড়ে নেব।

বিশ্বের রূপকে স্বরূপে আমরা জানবো। স্বরূপে জাগানোর জন্য নিজেই মন্ত্র হয়ে সাড়া দিয়ে যাব। তেঁতুল চিন্তাতে যদি লালা এসে পড়ে, তাহলে মন্ত্ররূপ তেঁতুলে কত লালা ভিতরে নির্গত (বের) হবে। মন্ত্রগুলো স্মরণ করে কেন নমঃ নমঃ করা হয়? সুচিন্তায় তুমি আহার করলে হজম ভাল হয়ে স্বাস্থ্য ভাল হবে। সব দেবতাকে তুষ্ট করে খাওয়া-দাওয়া করলে, সেই পরিবেশে Gland secretion ভাল হয়, হজম ভাল হয়।

গুরু কেন মন্ত্র দিলেন? তিনি বুঝে শুনে তোমার দেহক্ষেত্রে মন্ত্রের বীজ বপন করলেন। তুমি যদি সত্যের অভিনয়ের মঞ্চে অহর্নিশ সেই বীজমন্ত্রের স্মরণ কর, তবে তুমি বিশ্ব প্রকৃতির সুরে ভরপুর হবে। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, একটা জিনিস সব সময় অর্থবোধে চিন্তা করলে, বিশ্বরহস্যে ঐ চিন্তা অনুযায়ী বিশ্ব প্রকৃতি হতে ভরপুর হতে থাকবে। তারপর দেখবে তুমি বা তোমার চিন্তাধারা আকাশে বাতাসে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। জপটা কি? সুরের আকর্ষণে চুম্বকের ন্যায় টেনে নেয়। ভগ্নিপতি শ্যালক বললে মধুর। অন্য আর একজন বললে আবার গালি দাও চটে। আবার জগৎ ভর প্রত্যেকে প্রত্যেকের শালা।

মন্ত্রও তাই প্রথম অবস্থায় ভালো লাগে না। মন বসে না। সৃষ্টির কবলে যন্ত্রণাতেই প্রসবের সূত্রপাত হয়। ব্যথা বাড়াবার জন্য আবার ঔষধ দেয়। সাংসারিক যে অশান্তি, তা সুপ্রসবের ব্যথা। যে যা করে যাচ্ছে, বহুভাবে প্রসব করে যাচ্ছে। আমরা কচ্ছপের ন্যায় গুটিয়ে রয়েছি। বৈজ্ঞানিকেরা একের পর এক পাঁচ/দশখানা স্পুটনিক বের করছে। আছে তো অনেক শত শত। যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যথা শেষ হয়, একটার পর একটা বের হচ্ছে। সুপ্রসব যখন হবে, সব ব্যথার উপশম তখনই যে হবে। সুপ্রসব কাকে বলে? যখন তোমাতে আর বিশ্বের অণুপরমাণুতে একই সুরে মিশে যাবে। নদীর জল যেমন সাগরের সাথে মেশে, ঠিক তেমনি আজ্ঞাচক্র আর সহস্রারের যে মিলন, একেই বলে প্রকৃতি পুরুষের মিলন, শিব শক্তির মিলন।

গানে বাজনায়, মৃত্যুর ভয়ে, যন্ত্রণায় প্রকৃতির মাঝে চলেছে সোম আর লয়, আর তার ফাঁক। এগুলো সঙ্গম, স্খলিতের যে সঙ্গম, তবলার সঙ্গম, এও সঙ্গম। তুমি খেয়াল গাইছো। প্রকৃতি একটা তাল বাজিয়ে

যাচ্ছে। কবে যে সোমে আর ফাঁকে গিয়ে লয় হবে। দেহবীণাযন্ত্রের মাঝে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার— এই সপ্তচক্রের নাম করেছে কেন? এই চক্রে চক্রে মন্ত্রের সুর বাঁধা। শিবলিঙ্গের যে পূজা করা হয়, সেটি কিসের প্রতীক? শিবলিঙ্গ— প্রকৃতি পুরুষের মিলনের প্রতীক। আর এখানকার সব সঙ্গমই সীমাবদ্ধ। এখানকার সঙ্গমে ক্ষণিকের তৃপ্তি; তারপরে জ্বালা। কিন্তু আজ্ঞাচক্র-সহস্রারের মিলনে ঐ যে সঙ্গম, চিরসঙ্গম— সবসময় অহর্নিশ Mountain থেকে fountain-এর ন্যায় স্খলিতের ধারা প্রকৃতির যোনিতে বিরাম বিহীনভাবে হয়ে চলেছে। সেই আনন্দের যে অনুভূতি, কোন ভাষায় তার ব্যাখ্যা চলে না। তোমার দেহের ভিতরেই সেই আনন্দের সুর গাঁথা। সহস্রারে (মস্তিষ্কে) আছে সহস্র সূর্যের কিরণের ধারা।

এখানকার নারী পুরুষের যে সঙ্গম, সমুদ্রের এক ফোঁটা জলের ন্যায় স্বাধিষ্ঠানে বীর্যের স্খলন; সেই আনন্দেই সমস্ত জগৎ মাতোয়ারা। এই এক ফোঁটার জন্য কত ঝগড়া ঝাটি, মারামারি, কত কিছু হয়ে যাচ্ছে। স্বাধিষ্ঠানে এই মিলন, এই আনন্দ কিসের ইঙ্গিত? ঐ চিরমিলন, চিরসঙ্গম, চির আনন্দের ইঙ্গিত বহন করছে স্বাধিষ্ঠান। মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত এক একটি চক্রের মাঝে লক্ষ গুণ ব্যবধান। যেমন তোমার সাথে সূর্যের অনেক ব্যবধান; তেমনই মূলাধার হতে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান হতে মণিপুর, অনাহত লক্ষগুণের ব্যবধান। অনাহত হতে বিশুদ্ধ লক্ষগুণ ব্যবধান। আবার আজ্ঞাচক্র হতে সহস্রার লক্ষগুণের ব্যবধান। তোমার ভিতরে সহস্রারের ফোয়ারা যখন প্রকৃতির গহ্বরে লীন হয়ে যাবে, তখনই তুমি সেই চির আনন্দের তৃপ্তিতে, চিদানন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে।

এখানকার মিলনে আছে লজ্জা, ভয়-ভীতি; আছে অশান্তি। অশান্তিগুলো ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮ টোক্কার ন্যায়। টোক্কা কিন্তু একটাই। তুমি এক লক্ষই বল, দুই লক্ষই বল, মাত্রা একটাই। যখন এই মাত্রায় পৌঁছাবে, এই লয়ে পৌঁছাবে, তখনই সুপ্রসব হবে। তোমরা সেই লয়ে যাচ্ছ ঠিকই। তুমি ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮ই বল, ১৬ই বল, প্রকৃতি বলছে, 'আমি এক টোক্কাই দেব। তুমি যখন যাবে, তখন বাস্তবের এই সমস্ত সুর ও সাড়া এক টোক্কাতেই নেবে।' যত শাস্ত্র, পুরাণ সব ১/২/৩/৪।

প্রকৃতি বলছে, সহস্রারের সঙ্গে প্রকৃতি যখন মিলবে, তখন তুমিই সুর হয়ে যাবে। সাড়া দিয়ে মিলে গেলে দেহই তখন ভাব হয়ে যাবে। তুমিই যখন সাড়া হয়ে যাবে, তখন আর মিলবে কে? দুধ যখন রসগোল্লা হয়ে বের হয়ে আসে, সে কি জানতো, সে ঘাস ছিল?

একটু বুঝতে চেষ্টা কর। এত মধুর জিনিস। প্রকৃতি মিলবার জন্য দুঃখ-ব্যথা, রোগশোক, অশান্তি দিয়ে দিয়ে ১/২/৩/৪ করে করে যাচ্ছে। তবে গুণতে সময় লাগছে। গুণে যাচ্ছে, আবার মিলাতেই চাইছে। যে গুণে যাচ্ছে, সে মিলাবেই। গণিতে যখন ১/২ আছে, অগণিত (বহু) ধরা দেবেই। এসব মামুলি কথা নয়। বিজ্ঞান রয়েছে এতে। বিশ্বরহস্যের সমস্ত কিছুর সুর রয়েছে তোমাতে। অর্থবোধে তুমি যদি মন্ত্র (যাতে রয়েছে সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত অর্থ, ব্রহ্মের ব্রহ্মাত্ব, বিরাটত্ব) জপ কর বা চিন্তা কর, বিশ্বরহস্য হতে, প্রকৃতি হতে মনের চিন্তা অনুযায়ী ভরপুর হয়ে যাবে। তখনই সুপ্রসব হবে অর্থাৎ তুমি নিজেই স্রষ্টা হবে, সর্বদ্রষ্টা হবে। অন্তর্যামিত্ব, সর্বব্যাপ্তমানতা ইত্যাদি গুণগুলি তোমার আয়ত্তে এসে যাবে। তোমাতে আর অনন্ত বিশ্বে একই চৈতন্যের সুর খেলতে থাকবে। সহস্রারের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন হবে। এই সহস্রারের ফোয়ারা যখন প্রকৃতির গহ্বরে লীন হবে, তখন সেই চিরসঙ্গমে তুমি নিজেই সুর হয়ে যাবে। দেহই ভাব হয়ে যাবে। তুমি নিজেই সাড়া হয়ে যাবে। বিশ্বসৃষ্টি দর্পণস্বরূপ; নিজেকে গড়বার জন্য। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমরা সর্ব অবস্থায় চৈতন্যময়ের মধ্যে থেকে দেহ নিয়ে বিরাজ করছি।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৬৭
২৮, শরৎবোস রোড

সাধারণতঃ শূন্য থেকে আমরা যখন এসেছি, বিষয়বস্তু যা কিছু শূন্যেই যখন স্থিত; শূন্যে মন রাখা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ শূন্যকে আশ্রয় করেই ঘুরছে। আমরা যখন তারই (শূন্যের) মধ্যে রয়েছি, তখন আমরা শূন্য চিন্তা করবো; স্মরণে থাকতে গেলে মনও তারমধ্যে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। শূন্যচিন্তায় মনের মধ্যে কি কি আসে?

স্রষ্টা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কে সৃষ্টি করলেন? তিনি কোত্থেকে এলেন? একটা প্রশ্ন। যদি বলি, তিনি ছিলেন। তাঁর আগে কি ছিল? এই প্রশ্নের মীমাংসা এমনি হয় না। এই ফাঁকা, যার মধ্যে সব গ্রহ উপগ্রহ আছে, এটাই একটা বস্তু। ফাঁকা চিরকালই ফাঁকা। চিরকাল ফাঁকার যেমন শেষ নাই, চিরকাল শূন্যেরও তেমন শেষ নাই। ফাঁকাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। আর যা কিছু বিষয়বস্তু আনবে, সবকিছুই কে সৃষ্টি করলো? তাকে কে সৃষ্টি করলো? তার পূর্বে কে আছে? এই প্রশ্নই আসবে। কিন্তু ফাঁকা চিরকালই ফাঁকা। ফাঁকার এমনই অবস্থা, চিরকালই এমনি ছিল। সেই সত্তা (গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ) চিরকালই ফাঁকায় ছিল। কাজেই ফাঁকাকে কেহ কোনদিন সৃষ্টি করেনি; চিরকালই ছিল। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু তুলনামূলকভাবে ফাঁকার কাছে কিছুই না। বিশ্বপ্রকৃতিতে সমাধান বিনে (ছাড়া) কোন জিনিস থাকতে পারে না।

যখন চিন্তা আছে, মন আছে, দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে তখন সমাধানের ব্যবস্থাও আছে। সব কিছু সমাধানের মধ্যেই আছে। সেটা সাধারণ চিন্তার মধ্যেই আছে। এই যে ফাঁকা যার মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ঘুরছে, ফাঁকাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। ভগবান কে? তার বাবা কে? তার বাবা কে? এইভাবে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। মনে কর, পৃথিবী নাই, জীব নাই, গ্রহ

উপগ্রহ নাই। কিছুই না থাকলে তবে কি আছে? খালি জায়গা, ফাঁকা। এই খালি কোত্থেকে এল? যখনই 'খালি জায়গা আছে' বলছো, তখনই কিছু আছে। যেটাকে বেদ-বেদান্ত বর্ণনাতীতের মাঝে রেখে দিয়েছে। বিশ্ব জগতে সবকিছু ফাঁকা করে রেখে দাও। কেউ না থাকলে কি আছে? ফাঁকা আছে। একথা বললেই তখন বস্তুতে এসে যাচ্ছে। যখনই ফাঁকা, তখনই আঁকা হয়ে যাচ্ছে। তার উঁচুও নেই, নীচুও নেই। আমাদের পায়ের তলাতেও আকাশ, মাথার উপরেও আকাশ। ফাঁকার শেষ নাই; খালির শেষ নাই। যখনই যে বিষয়বস্তুর কিছুই নাই, ফাঁকার পর ফাঁকা, সেখানেই আছে আঁকা। এই ফাঁকা হতেই ভূলোক, জীবলোক সব আবির্ভূত। এই ফাঁকার ভিতর থেকেই সব বেরিয়েছে। **এই ফাঁকার স্রষ্টা কেহ নাই। তিনি স্বয়ং নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। এই ফাঁকার সংজ্ঞাটা কি? এই ফাঁকার যেদিন শেষ খুঁজে পাবে, সেদিন তোমার উত্তর পাবে।** সমস্ত ফাঁকাটাই চৈতন্য ও সচেতন। পৃথিবীর বালুকণা গোণা সম্ভব। কিন্তু মহাশূন্যের বুকে এত অগণিত গ্রহ উপগ্রহ আছে, গণনা করা সম্ভব নয়। এক একটা সৃষ্টিতে কত অগণিত সৃষ্টি। এখানে বাসে ট্রামে ঠোকাঠুকি হয়। কিন্তু মহাশূন্যে অনন্ত কোটি গ্রহে উপগ্রহে এসব হয় না।কারণ প্রত্যেকটির মধ্যেই ফাঁকার ইঙ্গিত আছে।

একটা মানুষ কত রূপে আঁকতে পারে; তার শেষ নাই। এই যে পৃথিবীতে বাস করছে কোটি কোটি লোক, কত জীব, কত জন্তু কারও সঙ্গে কারও হুবহু মিল নাই। কাজেই অদ্ভুত। অদ্ভুত কেন? অদ্ভুত থেকে এসেছে বলে। ফাঁকার আখ্যা নেই, ব্যাখ্যা নেই, শেষ নেই। রূপের শেষ নেই, বর্ণনার শেষ নেই, কিছুরই শেষ নেই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুই যেন অশেষের গীতগান গাইছে। বালুকণার কণা কণা নিয়ে এই পৃথিবী। মাটির উপর মাটি ফেলে ঢিপি উঁচু করতে হয়। তবে কি করে এই পৃথিবীর ঢিপি সম্ভব হল? কে করলো? এ কেবল ফাঁকার পক্ষেই সম্ভব। বস্তু খুঁজতে গেলে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফাঁকা হয়ে যায়। প্রতি বস্তুর মধ্যে ঐ ফাঁকাই পাবে। কে খায়, কে দেখে, কে শোনে খুঁজে পাবে না। স্পর্শ পাচ্ছে। কে পাচ্ছে জানে না। কে শ্বাস নেয়, কে অনুভব করে, খুঁজে পাবে না। খুঁজে না পাওয়াই ফাঁকা। ফাঁকার বর্ণনা, ফাঁকার রূপ অদ্ভুত। অদ্ভুত তার রেকর্ড। তোমার সত্তা কোথায় খুঁজে পাবে না। নাকে, কানে, চোখে, দেহে কোথাও না। নাক কাট, কান কাট, দেহ কাট— কে বোঝে, খুঁজে পাওয়া যায় না।

আবার জোড়া দিলে সব বুঝে। তখন বলে, 'হ্যাঁ, বুঝেছি।' এই দেহযন্ত্রের মাঝে আছে অদ্ভুত কারিগরী। অতি সহজে যন্ত্রগুলি আছে বলে দাম দিচ্ছ না। কিন্তু সহজ যন্ত্র নয়। এ যে কোথা থেকে আসে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই কি আছে এই ফাঁকায় যে, রূপগুলো আপন সুরে বেরিয়ে আসছে?

সমস্ত জগতের রূপই শূন্যের রূপ। ফাঁকায় আছ বলেই শুনতে পাচ্ছ। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে এই ফাঁকাই সজাগ হয়ে রয়েছে; প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগ। কোন্‌টা ভরতে (পূর্ণ করতে) পারছো? খেয়ে যাচ্ছ, ভরছে না। আবার উদর খালি। কোন্ ইন্দ্রিয়টা খালি না? ভরার উদ্দেশ্যে সবাই যাচ্ছি, কিন্তু ভরছে না। খেলে আবার পরক্ষণেই ক্ষুধা পায়। **মহাখালি (মহাশূন্য) হতে এসেছি বলেই কাউকে ভরা যায়না। কাকে তুমি ভরবে? পৃথিবী নিজেও শূন্যে ঘুরছে। এক বিন্দু জলও যা, সমস্ত জলও তাই। এক কণা ধুলার ক্ষমতা আর পৃথিবীর ক্ষমতা একই ক্ষমতা। কাজেই এই যে অবস্থা চলছে, তাকেই ভগবান বলে ডাকে।** ভগবান বললে আবার সীমায় এসে যায়। তাই বলি, আমাদের ভগবান সর্বত্র বিরাজমান।

ফাঁকায় সমস্ত ডাক মিশে যায়। মহাপ্রভু দু'হাত তুলে দেখালেন, ঐ যে খালি জায়গা, ঐ যে মহাশূন্য, যা চেতনা ও চৈতন্যে ভরপুর, তোমরা তারই স্মরণ নাও। তাছাড়া আর পথ নেই। তিনি দেখলেন, সমস্ত আকাশটাই ফাঁকার রূপ। এই রূপটা কি? অসীম অনন্ত নীলাকাশ। এই রঙ রঙ নয়। আকাশের রঙ কি আমার জানার দরকার নেই। আমরা দেখছি, নীল আকাশের মধ্যে আমরা আছি চিরকাল। তিনি কৃষ্ণকে আনলেন একভাবে। রামকে আনলেন, মহাদেবকে আনলেন। আমাদের জীবনে চলার পথে যদি সেভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে খুঁজি, সব নিখোঁজের মাঝে লীন হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু দেখছো, যা কিছু খাচ্ছ, কেউ স্থান স্থিতির মধ্যে নেই। এই জীবনের গতিবিধিতে অণিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা ইত্যাদি আটটা শক্তির নাম যে শুনেছ, সেই শক্তিগুলি এই দেহের মধ্য দিয়েই সাড়া দিচ্ছে। তারা বলছে, মিশে যাওয়ার ক্ষমতায়, মিশে যাওয়ার ইঙ্গিতে স্পর্শে আমরা সবসময় সজাগ। কাজেই আমরা যদি স্পর্শে সবসময় সজাগ থাকি, আমরা বিরাট সেই ফাঁকার মধ্যে বিরাজ করছি। সেই হরির নাম স্মরণ করছি। সেই হরির নাম নিয়ে যদি সবসময় থাকি, তবে স্বাভাবিকভাবে সেটাই ধ্বনি হয়ে যায়।

খালি জায়গায় (শূন্যে) প্রতিমুহূর্ত্তে সৃষ্টি হচ্ছে। এই খালি জায়গায় পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছড়া, আগুন, বাতাস, শিলা কি না আছে? জগতের রূপটা অদ্ভুত রূপ; সবই ফাঁকার রূপ। এই যে বর্ণনাতীত, কথাটা শুনেছ, প্রতিটি বস্তুই বর্ণনাতীত, কাউকেই ব্যাখ্যায় আনা যায় না। এই ফাঁকার মধ্যে এমনি সব আঁকা হয়ে আবার ফাঁকায় চলে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের ধ্যান-ধারণায় চিন্তাধারায় সবকিছু থাকবে। **যে গতি হতে যেভাবে এসেছি আমাদের দেহে যা অনুভব করছি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ফাঁকাটা অতিমাত্রায় সচেতন। তার বর্ণনা শুধুমাত্র তাকিয়ে থেকে কি করে বুঝবো? এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিষয়বস্তুর দ্বারা বুঝতে পারছি; আমরা নড়ছি, চড়ছি, অনুভব করছি এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করছি যে, সমস্ত ফাঁকাটাই চৈতন্য-সচেতন। সমস্ত ফাঁকাটাই চৈতন্যময়। সেই চৈতন্যময় অবস্থা সর্বজীবে সর্বভূতে বিরাজমান।** আমাদের যতটুকু বুদ্ধিবৃত্তি আছে, তা দিয়েই সেই বিরাটকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পর্কে যতই চিন্তা করি, আশ্চর্যের পর আশ্চর্যই শুধু হতে হয়। এই ফাঁকা হতেই এগুলো বের হচ্ছে। সমস্ত ফাঁকাটাই স্বয়ং চৈতন্য। দেহের মাঝে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রবল। যে পর্যন্ত চক্ষুর ক্ষমতা আছে, (দৃষ্টিশক্তি আছে), দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহু কোটি কোটি মাইল নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে। কেন ইন্দ্রিয় শক্তি এত প্রবল করেছে? তোমরা যতদূর খুশী ফাঁকায় তাকিয়ে যাও। এই সাধারণ চক্ষু কোটি কোটি মাইল চলে যাচ্ছে। এই চলে যাওয়ার সাথে সাথে মনও বহু দূর চলে যাচ্ছে। **আমরা সর্ব অবস্থায় চৈতন্যময়ের মধ্যে থেকে দেহ নিয়ে বিরাজ করছি। প্রতিমুহূর্ত্তে ফাঁকাকে বা চৈতন্যময়কে যদি স্মরণ করি, স্মরণের সাথে সাথে ফাঁকার মধ্যে সাড়া পাব।** এই অবস্থাটা ভরপুর হয়ে রয়েছে মহাশূন্যে।

আবহমানকাল থেকে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় চলেছে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য। এই যে মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ চলে যায়, কোথায় যায়? কেনই বা আসে? কিছুকাল থেকে কেনই বা থাকে না? কি তার ইঙ্গিত? এখানে কে এল বা কে গেল, তার কোন মূল্য নেই। মায়ের সামনে ছেলে মরে যাচ্ছে। ছেলের সামনে বাবা চলে যাচ্ছে। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা-বেদনায় প্রতিমুহূর্ত্তে জর্জরিত হতে হচ্ছে। **প্রকৃতি বলছে, ঐ রোগ রোগ**

নয়। ঐ শোক শোক নয়। ঐ দুঃখ দুঃখ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ফাঁকার সঙ্গে মহাচৈতন্যের সঙ্গে এক যোগাযোগে যুক্ত হতে না পারছো, ততক্ষণ এগুলো চলতেই থাকবে। আমাদের মায়া মোহ শুধু ব্যথার মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এই আঘাত প্রতিঘাত প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে, তুমি এই জাগতিক বিষয়বস্তু হতে তোমার পাথেয় সঞ্চয় করে নাও। কোন্ বিষয়বস্তুর জন্য শোক করছো? কার বিষয়বস্তু, যার জন্য তুমি দুঃখ করছো? **এই যে ব্যথাবেদনার উদ্ভব হচ্ছে, মহাচৈতন্যের ধারা হতে,** ফাঁকা হতে এগুলি তোমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সমস্ত ব্যথা-বেদনা সেখানে পৌঁছে দাও, সেই পরমচৈতন্যে মিশিয়ে দাও। বারবার হারিয়ে যাওয়ার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছ।

চৈতন্য বলছেন, আমারই মতো সজাগ হয়ে একটা বিষয়বস্তু ধারণ করে বিরাজ কর। ফাঁকার মধ্যে নাক, মুখ, চোখ, কান খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈতন্য বলছেন, আমার সত্তা আমি খুঁজে পাই না। আমি তোমাদের জন্য ব্যস্ত নই। ব্যস্ত কেবল নিজেকেই খুঁজে পাবার জন্য। আমি আমাকেই খুঁজে পাবার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করি। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, এই কথাগুলি কোথা হতে আসছে? সেই বিরাটের ভাণ্ডার হতেই যত কথা, টুকরো টুকরো বুদ্ধি, মনের যত ভাব ও ভাবনা, সব আসছে। বাপের যদি রোগ হয়, ছেলে তাকে জড়িয়ে ধরে। বাপের ব্যথা বুঝে তাকে নিরাময় করার জন্য, রক্ষা করার জন্য বিধিব্যবস্থা করে। বাপকে সেবা করার জন্য ছেলে ব্যাকুল হয়ে যায়। এই বুঝ যাতে আমরা সেই 'বুঝে' ফেলতে পারি, তারই চেষ্টা করতে হবে। আমাদের ব্যথা বুঝে যিনি সৃষ্টি করেছেন, এই ব্যথার বুঝ দিয়ে যেন তাঁকে বুঝতে পারি। আমরা যেন তাঁর সেবা করতে পারি। এইভাবে যদি অগ্রসর হই, যদি আপনসুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি, নিশ্চয়ই সাড়া পাব। **রেফ্রিজারেটারে জল নাই, খালি জায়গায় কেমন সুন্দর বরফের চাকা হয়ে যায়। তেমনি এই ফাঁকা জায়গার মধ্যে বরফের চাকার মতো তোমার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে স্বয়ং রূপ নিয়ে তোমার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে।**

মুক্ত আকাশে মনকে ছেড়ে দাও। সাগরের পারে মুক্ত বাতাস। মুক্ত জায়গায় যাওয়া মানেই বাতাস খাওয়া। তুমি মুক্ত, সর্ব অবস্থায় মুক্ত, এই ভাব সর্বদা মনে রাখবে। তুমি মুক্ত জায়গা হতে এসেছ। নিজেকে কখনও

পাপী ভাববে না। তুমি মুক্ত,কতবড় জায়গা হতে, বিরাট জায়গা হতে এসেছ। কঠিন মনে হলেও এইভাব অতি সহজ। আমরা ক্লেদ মুক্ত। আমাদের কোন ক্লেদ নেই। আমরা সর্ব অবস্থায় মুক্ত অবস্থায় রয়েছি। ধীরস্থির হয়ে যদি ভাবি, এভাবে ভাবলে আপনিই স্ফূরণ হবে। এখানে কোন কিছুর দিকে তাকাবে না। যা হবার হবে, যা চলবার চলবে। **এখানে যে শান্তি চাও, এই চাওয়ার তো কোন মানে হয় না। উপরে ফাঁকা, নীচে ফাঁকা। কাজেই কি চাইবে এখানে? টাইটানিক জাহাজে খেলার জায়গা আছে, ক্লাব আছে, সিনেমা হল আছে। আরও কত কি আছে। যতই নাচানাচি করুক, জাহাজ তো জলের উপর ভাসছে।** আমাদের জাহাজ শূন্যের মধ্যে টলমল। সমস্ত শূন্যটাই বিরাট ফুটো। আমরা এই ফুটোর মধ্যে আছি। পায়ের তলায় ফাঁকা, মাথার উপরে ফাঁকা। এই ফুটোর মধ্যে তুমি কি শান্তি পাবে? এ যেন সেই ভূতের বেগার খাটুনি। ভূতকে কাজ দিতে পারছে না। শেষবেলা একগাছা দাড়ি দিয়ে বললো, 'এই দাড়িটা সিধে (সোজা) কর'। দাড়িটা টানলে সিধা। ছেড়ে দিলেই আবার যে কে সেই। তাই দাড়িও সিধা হয় না। আর ওর টানাও শেষ হয় না। আমরাও এভাবে সময় নষ্ট করছি।

গাড়ীতে (পৃথিবীতে) বসে আছি। এই দাও, ঐ দাও করতে করতে গাড়ীতে তাস খেলা শেষ। তারপর হাই তুলছি। কিভাবে যে সময় নষ্ট করছি। বাবার অসুখ, মায়ের অসুখ। হাট করছি, বাজার করছি। সময়গুলো তো কাটাতে হবে। অদ্ভুত ছকের খেলা। ইন্দ্রিয়ের চাহিদা মিটাবার জন্য নানাদিক দিয়ে সময় নষ্ট করছি। একটা ড্রাম ফুটো, তাতে একশো জন লোক জল ঢালছে। বালতির পর বালতি দিয়ে জল ভরছে, ফুটো দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ভরছে না আর। যখন জানবে ড্রাম ফুটো, বালতি রেখে দিয়ে বসে পড়বে। মানুষ শান্তির কামনা কেন করে? এই শান্তির কামনার একটা অন্তর্নিহিত সুর আছে। তবু মরণ সেবা আছে না? মানে থাকবে না। দু'দিন পর মারা যাবে; তাই একটু সেবা করলে। প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ থাকো, সময় আর নেই। দৌড়াদৌড়ি করছো। আজ হাসপাতাল, কাল শ্মশান সব ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ। **এখানে কারো কিছু থাকে না, থাকবে না। থাকবে শুধু ঐ বিরাট শক্তির সাথে যোগাযোগ। যতদিন না মহাশূন্যের মহাচৈতন্যের সাথে মিলতে পারবে, ততদিন এই ছকের খেলা চলতে থাকবে।** যেদিন

তোমার মাঝে মহাশূন্যের অনন্ত শক্তির স্ফূরণ হবে, সেদিন তুমিই পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারবে।

প্রকৃতি বলছেন, 'এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পৃথিবী, অগণিত জীব— সবাইকে আমি আমার স্বরূপে আনতে চাই।' আনছে অনেক, এনেও আবার মিশে যাচ্ছে বিশ্ব মহাচৈতন্যের মহাসৃষ্টির মধ্যে। আপনি আপনসুরে যেভাবে চলেছে সৃষ্টির ধারা, আমরা যেন এই বিশ্বের মহাফাঁকার মধ্যে আপনি আপনসুরে নিজের ইচ্ছাধীনে চলতে পারি। যতদিন না নিজের ইচ্ছাধীনে চলতে পারি, জন্ম-মৃত্যুর ছকে আসা যাওয়া চলতেই থাকবে। ইচ্ছাধীনে তুমি তোমার মধ্যে ভরপুর হয়ে রয়েছ। স্বাদটা কোথায়? তৃপ্তিটা কোথায়? **তুমি যে তৃপ্তিটা পাচ্ছ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, ইন্দ্রিয়ে ন্যস্ত। তাই যদি হয়, তাহলে তাঁর সেই পরমতৃপ্তিতে মগ্ন থাকবে। সে নিজে তৃপ্ত হয়ে তোমার ইন্দ্রিয়ে ন্যস্ত আছে বলেই সেই সুরে মগ্ন আছে। কাজেই মহাচৈতন্যের সুরে যদি মগ্ন থাক, তবেই ভরপুর হয়ে যাবে।** ফাঁকা বলছে, ভাল লাগুক, না লাগুক, তুমি আমার মধ্যে ভরপুর থাকো।

ভক্ত — সব বুঝেও আমি অবুঝ। বুঝতে বুঝতে কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না।

ঠাকুর — ফাঁকা বলছে, আমি তো বুঝি না। এই যে অবুঝ, এটাও ফাঁকা। বুঝলে তো সীমার মধ্যে এসে পড়লে। সীমা নাই, ফাঁকা। এই যে অবুঝ ফাঁকা। অবুঝ হলেই হাতটা উপরে দিয়ে বলবে, বুঝি না। এই 'বুঝি না' রূপটাই ঠিক। এখানে বুঝার রূপ কি কিছু আছে? বুঝে ফেললেই তো হয়ে গেল। বিরাট আর রইলো না। কাজেই সব বুঝের অতীত হয়েই রয়েছে ফাঁকা।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

বুঝ যাতে আরও বুঝে আসে, চৈতন্য আরও ভরপুর হয়ে ওঠে, তারজন্যইতো সাধনা

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

সুখচর ধাম

সাধারণঃ 'Common Sense' কথাটির অর্থ করা হয়, 'কাণ্ডজ্ঞান'। এই অর্থকেই আরও ব্যাপকভাবে নিয়ে, গাছের কাণ্ড যেমন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফলে প্রসারতা লাভ করে, সেই বিস্তীর্ণতার দিকটাতেই **'কাণ্ডজ্ঞান' কথাটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয় বিভিন্ন নামকরণে— কখনও জ্ঞান, কখনও বিচার, কখনও বুদ্ধি, বিবেক বা চৈতন্যরূপে। এক কাণ্ডজ্ঞান থেকেই এত সবের সৃষ্টি। মাত্রার তারতম্যে এক এক নামে নামকরণ করা হয়েছে।** Common Sense বা কাণ্ডজ্ঞানকে আমি এইভাবে ব্যাপক অর্থে সুতোর মত টেনে টেনে কয়েকটি কথা বলে যাচ্ছি।

সাধারণভাবে বলা যায়, জল নিম্নগামী। জলের ধারা ঢালুর দিকেই প্রবাহিত হয়। কিন্তু প্রসারতায় প্রকৃতির নিয়মের আবর্তনে সে ঊর্দ্ধমুখী হয়েই আছে। আমরাও তো প্রকৃতির সন্তান। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম— এই পঞ্চভূতের সন্তান। প্রকৃতির প্রতিটি জীবের মধ্যেই তো শতকরা ৮০ ভাগ জল আছে। সবার ভিতরেই জলের আসা যাওয়া, যেন washing system-এ আমাদের শোধন করে চলেছে। আমাদের sense বা চৈতন্য কিভাবে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে সংশোধনের পথে চালিত করছে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। যে জল জীবজগতে আছে, এমনি থাকলে কবে দূষিত হয়ে যেত। তাই যেন সে গতির পথে তার গতিপথ বেছে নিয়েছে। কোন দূষিত পদার্থই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। বহু জলাধারের জল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেই জলই স্রোতের সঙ্গে মিশে প্রাকৃতিক উপায়ে পরিশোধিত হয়ে যাচ্ছে।

তোমাদের এই দেহ যেসব বিষয়বস্তু দিয়ে গঠিত, সেইসব বস্তুর প্রতিটিই সংশোধিত হয়ে যার যার গতির পথে চলেছে। 'Sense' বা জ্ঞান বা বুঝ আমাদের সেইভাবেই চালিত করছে। তাই আমরা যখন নিজেরা নিজেদের কথা ভাবি, তখন ভাবনার সমুদ্রে যেন তলিয়ে যাই। তখন আমাদের বারবার ভাবিয়ে তোলে, আমরা কোথায়, এখানে না সেখানে? প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে

মনে হয়, আমরা এখানে। কিন্তু আমরা যে সত্যই প্রতিমুহূর্ত্তে বিলয়ের পথে, মিশে যাওয়ার পথে মিশতে মিশতে চলেছি, সেই বিলীনতার দিকটাই যাতে চেতনার সাথে থাকে, সেই বোধটা যাতে বোধে থাকে, তারজন্যই sense বা চৈতন্য সবসময় সচেতন। এই সচেতনতার দিকটা যাহাতে সর্ব অবস্থায় বিরাজ করে, তার সাধনাই হল জীবজগতের সহজাত সাধনা। এটাই উপলব্ধি করতে পারছি। সৃষ্টির যেন এটাই উদ্দেশ্য। সেই পথে জীবকুলকে চালিয়ে নেওয়াই যেন চৈতন্যের একটা কাজ। সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যই জীবজগৎ এইভাবে চালিত হয়ে আসছে। এটাই সহজাত বুদ্ধিতে সহজবোধে আসছে। জীবজগতে বাধা বিঘ্নগুলো সাহায্যকারী রূপেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি হোঁচটের কারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তাই সাথে সাথে সাধনা হয়ে যায়। Common Sense বা কাণ্ডজ্ঞানই এখানে সবসময় কাজ করছে। বুঝটাই এখানে বড়। আমাদের তো সেইটাই সাধনা। **বুঝ যাতে আরও বুঝে আসে, চৈতন্য আরও ভরপুর হয়ে ওঠে, তার জন্যই তো সাধনা। আমাদের ত্রুটিগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি, তবেই আসবে সংশোধন।**

যা কিছু শোনার বস্তু আছে, শুনবে। তার থেকে বেছে নেবে প্রকৃতির পক্ষে কোন্‌টা প্রয়োজনীয়। আমার চোখেও সব পড়ে। তবে আমার দৃষ্টি ঊর্দ্ধাকাশে। সর্বত্র সর্ব অবস্থায় আমার দৃষ্টি ঊর্দ্ধমুখী হয়ে আছে। সেইভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোও মহাকাশের সুরে বিরাজ করছে।

তোমার ভিতরে যে চেতন বা চৈতন্য রয়েছে, যার থেকে তুমি সবকিছু উপলব্ধি করতে পারছো, সেই চৈতন্য যাতে মহাকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, এই চৈতন্যকে নিয়েই যাতে চিরকাল বিরাজ করা যায়, সেইটাই হবে একমাত্র সাধনা।

চৈতন্যের উৎপত্তি মহাকাশ থেকেই। মহাকাশে মহাশূন্যে চেতনার সমুদ্রকে মন্থন করে যে চৈতন্যের সৃষ্টি, তা যেন সর্ব অবস্থায় চিরকাল মহাকাশে, তোমার চেতনায় ভাসমান থাকে, তবেই হবে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সফলতা।

বহু পদার্থের সংমিশ্রণে তুমি বাস্তবের দেহ নিয়ে এসেছ। চৈতন্য বা চেতন, তার থেকেই তুমি সবকিছু উপলব্ধি করতে পারছো। এই হচ্ছে চৈতন্যের রূপ, চৈতন্যের স্বরূপ। বুঝতে পেরেছ? আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

লোভের হাঁড়িতে পড়ে যদি মর, তবে আর কিছু বলার নেই

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
সুখচর ধাম

জীবনযাত্রার পথে সমস্যা সর্বদিকে। সমস্যা নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। সমস্যা দূরীভূত করা যায় কিনা, সেটাই সাধনা। বিচার যদি প্রকৃতির নিয়মে আসে, তবে স্বীকার্য। দ্বন্দ্ব, সমস্যাই সমাধানের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে আসার কারণটা কি? সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, কারণ ছাড়া সৃষ্টি হয় না, মনে রেখো। সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, প্রয়োজনের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় বস্তু এসে যায়। বীজ আকার নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। **বীজশক্তিটা হ'ল বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট শক্তি। সেই শক্তি তোমাতে নিহিত, ফুটে বের হবেই। বের হবার জন্যই জন্ম। চৈতন্যমুখী হয়ে চৈতন্যে ভরপুর থাকো। সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এই। মূল হচ্ছে চেতন; চেতন নিয়েই আসছো।** ওটাই ফুটে বাহির হবে। বীজ আর চেতন তফাৎ নেই। একটি ফুটবার পথে, আর একটি ফুটে আছে।

আমরা নানা আকর্ষণে যুক্ত আছি বলে ইন্দ্রিয়গুলো ঐমুখীই আছে। মন আপনগতিতে চলতে থাকে, আর কিছু অংশ ইন্দ্রিয়মুখী হয়। স্বাদ সোয়াদই কামনা বাসনা। এই ইচ্ছাশক্তির বিরাট ক্ষমতা। এখন ইন্দ্রিয়মুখী হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। ইচ্ছাটা যেদিকে খুশী যাক না কেন, ধ্যান-ধারণার কোন অসুবিধা হয় না। তুমি যেদিকেই যাওনা কেন, সাধনার পথ সহজ সুগম থেকে যায়। চৈতন্য কখনও ব্যথা-বেদনার ভাগী হয় না। **চৈতন্য যখন দেহ ধারণ করে, তখন দেহের বৃত্তিগুলির সাথে একাত্ম হয়ে যায়। চৈতন্য আলাদা থাকলে দেহ উঃ আঃ করে না। দুটো ঠ্যাং কেটে নিলেও বোঝে না। চৈতন্য দেহধারণ করলে ব্যাবহারিক জগতের সবকিছু মেনে নেয়।** অজ্ঞান করে নিলে স্পর্শে ঠিক বোঝে কিছু একটা হচ্ছে। তোমরা দেহধারণ করেছ বিরাট চৈতন্যকে অনুভব করার জন্য। বিদেহী দেহধারণ করতে ব্যস্ত।

দ্বন্দ্ব, সমস্যা, অবিশ্বাস, এসবের অর্থ আমি চাই জানতে বুঝতে। তুমিই তো বেদ বহন করছো। উন্মাদনা, কামনা, বাসনা— সব কিছু তোমার মধ্যে থাকবে। যে বোঝে না, তাকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বুঝের দিকে নিয়ে যায়। তবে সবাই বোঝে না কেন? **বিশালত্বে না থাকলে বিশারদ হওয়ার চিন্তা হয় না। ধ্বনি ও নাদের কথা সদাসর্বদা স্মরণ করবে। যেদিকে তুমি যাও, কামনা বাসনা ইত্যাদি শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত মুক্তাকাশে বিচরণ করবে। একসুরে বাঁধনের জন্যই এত সুর। সব নোংরা, রোগ, শোক সবই আকাশমুখী। সব রাস্তাই আকাশের রাস্তা। লোভের হাঁড়িতে পড়ে যদি মর, তবে আর কিছু বলার নাই।**

তোমাদের জীবন চৈতন্য যেভাবে জন্মগত মহানের কাছে থেকে রক্ষা পাচ্ছে, চিন্তা করলে ফাঁকার মধ্য দিয়ে অনেক দূর চলে যাওয়া যায়। জন্মগত মহানের সাথে মহাশূন্যের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ— প্রতিটি বিষয়বস্তুর যোগাযোগ আছে। প্রত্যেকে একই বিষয়বস্তু দিয়ে গড়া। আকাশ, বাতাসের মধ্য দিয়ে, ফাঁকার মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুগুলি চলে যায়।

আগুন জ্বলছে, দূর থেকে তাপ পাচ্ছ। ফাঁকার মধ্য দিয়ে তাপ যাচ্ছে। নানা যোগাযোগের ভিতর দিয়েই এই তাপ পাচ্ছ। ফাঁকার মধ্য দিয়ে তাপ বহন করে আনছে। এই যে তাপ, ঠাণ্ডা বা গরম চিন্তার সাথে সাথে, মননের সাথে সাথে দূরত্বের ভিতর দিয়ে, ফাঁকার ভিতর দিয়ে মনের বিষয়বস্তুগুলি এগিয়ে যায় মিলন না হওয়া পর্যন্ত। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির প্রতিবস্তুতে প্রয়োজন যেমন আছে, মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। গ্রহে গ্রহান্তরে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের টান আছে। এক গ্রহের ইচ্ছার সাথে আরেক গ্রহের ইচ্ছা যোগাযোগসূত্রে গাঁথা। এইভাবে একের সাড়া ও সুর যায় টানের যন্ত্রের মাধ্যমে।

তুমি জপধ্যান করছো। মন তেমনি যাচ্ছে শূন্যমার্গে। ঠিক যেখানে সচেতন আছে, সেই সচেতনের সুরে ও সাড়ায় যেভাবে জগৎ গড়ে উঠেছে, সেই মহাসচেতন যেখানে বিরাজ করছেন, মন সেখানে মাত্রায় মাত্রায় উঠে যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত যোগাযোগ হচ্ছে, ততক্ষণই উঠতে থাকে, আবার পতনও হয়। **মূলাধার থেকে কুলকুণ্ডলিনী সর্প জেগে উঠতে থাকে। সহস্রার ভেদ করে অনন্ত ফণা বিস্তার করে। ধ্বনি ও জ্ঞানের বিকাশ হয়**

এই সহস্রারে। নিম্নগামী সৃষ্টি উপর দিকে উঠতে থাকে। আজ্ঞাচক্র (দুই ভ্রূ-র মধ্যবর্ত্তী স্থান) আর সহস্রারের (মস্তিষ্কের) মিলনে হয় অপূর্ব সৃষ্টি। কখনও দেখা যায়, ধ্যানের দেবতা তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। এইভাবেই মহাপ্রভুর বিষ্ণুদর্শন। এটা একটা ভাব, একটা ধারা। যখন কাজ (জপ-ধ্যান) করবে, আপনিই অনুভূতিতে মিশে যাবে।

সহস্রার বিকশিত হলে মিলবে চিদানন্দ, চির আনন্দের ধারা। আর এখানকার আনন্দ এক কণামাত্র। এখানকার বৃত্তির নিবৃত্তির তৃপ্তি হচ্ছে অনন্ত বিশ্বের অফুরন্ত তৃপ্তির নমুনামাত্র। বেদ বলছেন, সুরটা ঠিকই পেয়েছ। কিন্তু তৃপ্ত হতে পারছো না। জানানো হিসাবে তোমার দেহের ইন্দ্রিয়ে আমার স্বাদই সাজিয়ে রেখেছি, অতি ক্ষুদ্র আকারে। **ছেলে মেয়ে, বাপ মা, আনন্দ কিছুই ধরে রাখতে পারছো না। সুখের সংসার গড়তে পারছো না; কেন? কারণ প্রকৃতি বলছেন, রাখবার জন্য তো তোমাদের এখানে আনিনি। শুধু নিজেকে বিরাটভাবে উপলব্ধি করার জন্য তোমাদের এনেছি।**

এখানে ঝগড়া, ছল-চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা সব করে যাচ্ছ। একটু স্বাদের মারপ্যাঁচে এই নমুনা নিয়েই মারামারি করছো। মিষ্টত্ব ভোগটা কে করছে? চিনির মিষ্টত্ব বার করে জিহ্বায় চিনি দিয়ে, তুমি তোমার মধ্যে তৃপ্ত হয়েছ। ঘ্রাণের যন্ত্রের মাধ্যমে ফুলের গন্ধে তৃপ্ত হচ্ছো। সুন্দর দৃশ্য চোখে নিজে দেখে তৃপ্ত হচ্ছো। তোমার চেতনায় দেখছো, কি সুন্দর। চোখের মাধ্যমে প্রকাশ হল মাত্র। তিনি (সচেতন) বুঝিয়ে দিচ্ছেন তোমাদের যন্ত্রের মাধ্যমে। **অনন্ত চৈতন্যের সূক্ষ্ম চেতন দ্বারী হয়ে আছেন তোমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে। তোমার মধ্যে চেতন রয়েছে সর্বত্র। মহাচেতনের যোগাযোগসূত্রে তুমি বাঁধা। ইন্দ্রিয়ের এই ক্ষুদ্র তৃপ্তিতে তৃপ্ত থাকলে চলবে না। আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে মনোনিবেশ করতে হবে।**

দেবর্ষি বললেন, আমাদের কাজ শুধু নাম করা আর গান করা। যা কিছু কর, নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় নিবেদন কর। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কুচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
১০) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১১) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কুচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
১২) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১৩) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৪) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৫) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৬) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কুচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
১৭) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৮) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৯) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২০) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
২১) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
২২) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৩) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫